একাল চিরকাল

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

উৎসর্গ

শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার দত্ত

এই লেখকের

পূর্ব-পুরুষ (১ম ও ২য় পর্ব)
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
রাণী কাহিনী
পাও নাই পরিচয়
কলকাতার কাছেই
দহন ও দীপ্তি
পৌষ-ফাগুনের পালা
আমি কান পেতে রই
বহ্নি-বন্যা
ভাড়াটে বাড়ী
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
শুভ-বিবাহ কথা
মনে ছিল আশা
এক প্রহরের খেলা
সোহাগপুরা
জীবন-স্বপ্ন
সমুদ্রের চূড়া
জন্মেছি এই দেশে
কোলাহল
নারী ও নিয়তি
জ্যোতির্ময়ী
বড় ছোট এবং মাঝারি
লিপিলিপি (নাটক)
আব্ছায়া
তিনে একে চার
রাত্রির তপস্যা
প্রেরণা
আনারকলি (নাটক)
তবু মনে রেখো
ছুটি
তৃতীয় রিপু
রমণীর মন
প্রভাত সূর্য
জ্বলে নেভে জোনাকি
তারা ভৈরবী
যোগাযোগ
আকাশের সীমা নাই
স্মরণীয় দিন
কুবেরের অভিশাপ
বিজয়িনী
পুনর্ণবা
স্বপ্ন আমার জোনাকি
নববধূ
জায়া নয় দয়িতা
নীলকণ্ঠী
বাহির-বিশ্ব
রাত্রির সীমানা
শ্রেষ্ঠ গল্প
রক্ত কমল
দেহ-দেউল
নবজন্ম
কঠিন-মায়া
গল্প-পঞ্চাশৎ
স্বপ্ন-সন্ধ্যা
সুপ্তি-সাগর
উপকণ্ঠে
তব দক্ষিণ পাণি
একদা কী করিয়া
বক্ষে বাজে বাঁশী
হে নিরুপমা
রাতের বাসা

॥ ১ ॥

ঘুম ভাঙতে হারুর রোজই দেরি হয়, মানে নিজে থেকে ওঠে কদাচিৎ। অনেক রাত অব্‌দি জাগারই ফল এটা। সবাই ঘুমোলে, প্রায় রোজই দেওয়ালের ইট-বার-করা সেলাই বেয়ে ছাদে উঠে ওধারের পাইপ বেয়ে নেমে যায়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দিয়ে সিগারেট খেয়ে এসে আবার শোয়। ফুচুনের ভাষায় 'রোঁদে' বেরুনো। রোঁদ কাকে বলে তা হারু জানে না, বিশেষ কৌতূহলও নেই। এমনিই ওকে একটু করুণার চোখে দেখে ফুচুনরা। বোকা এবং গরিব বলে, এই সব কথার মানে জিজ্ঞেস করে আরও বোকা সাজতে রাজী নয়।

বেশী রাত অব্‌দি জাগলে উঠতে দেরি হবে—এ স্বাভাবিক। তাতে ক্ষতিও নেই কিছু, জানে মা ঠিক ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দেবে। নিজের গরজেই ওঠাবে, দুধ আনার গরজ। সেজন্যে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমোয়। নিজে থেকে ওঠার চিন্তা থাকে না। আজ কিন্তু অন্য একটা কারণে ঘুম ভেঙে গেল হারুর। কী একটা অপ্রীতিকর কারণ। কী, সেটা বুঝতে দেরি হলেও,—গাঢ় ঘুমের মধ্যেও সেই অনুভূতিটাই প্রথম হ'ল। কী একটা অশান্তির কারণ ঘটেছে কোথাও। অরুচিকর অশান্তি—আর তার মধ্যে সেও বোধ হয় জড়িত আছে। একেই কি 'গিল্‌টি কনশেন্স' বলে—রবীন মাস্টারমশাই প্রায়ই যে শব্দটা ব্যবহার করেন, আবার বাংলায় বুঝিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে—'অপরাধী বিবেক'? দুটোর কোনটাই বোঝে না অবশ্য হারু—আন্দাজে আন্দাজে একটা মানে ক'রে নিয়েছে।

মার সবল হাতের রূঢ় ঠেলা নয়, কোথায় কি চেঁচামেচি হচ্ছে, তাইতেই আস্তে আস্তে ঘুমের জড়তা কাটা—একটু দেরিই হ'ল

পুরোপুরি সচেতন হতে। কিন্তু সচেতন হবার পরও নড়তে পারল না, হাত-পা যেন পাথর হয়ে গেল ব্যাপারটা বোঝার পর।

ওর বাবাই চেঁচামেচি করছে।

বাড়িতে কি বাড়ির সামনে ঠিক নয়—একটু এগিয়ে গলির মোড়ে গিয়ে চেঁচাচ্ছে, হারু অনুমান করল, যেখান থেকে ফুচুনদের বাড়ির তেতলার বারান্দাটা দেখা যায়। একটু দূরে বলেই ঘুম ভাঙতে কিছু দেরি হয়েছে, এ বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচালে তো সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেত। বাবা তা করবে না। ঐ ফুচুনদের ওপরই ওর সন্দেহ, তাদের শুনিয়েই গাল দিচ্ছে।

'শুনেছেন, ও জীবনময়বাবু! আজ আমার বাড়ির কলটা গেছে! পাড়ায় যত্ত হয়েছে সব বকা বেকার ছেলের আড্ডা, এ তো দেখছি এদের হাত থেকে বাঁচাই মুশকিল! ঐ পুরনো পেতলের কল, এ নিতে কোনো প্রোফেসনাল চোর আসবে না। এ বাবুদেরই কাজ। কত আর দাম পাবে—পাঁচ গণ্ডা কি ছ-গণ্ডা পয়সা—খুব পেলে তো চল্লিশটে নয়া পয়সা—এক প্যাকেট সস্তার সিগারেট হবে বড় জোর।...শুয়োরের পাল ছেলের জন্ম দিয়ে সব নিশ্চিন্তি! না পারে লেখাপড়া শেখাতে, না পারে বিড়ি-সিগারেটের খরচা যোগাতে—আর বিড়ি কি, এখন তো আবার ঢুকু-ঢুকুও শুরু হয়ে যায় পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে—! যত্ত সব হারামজাদা খানকির ছেলের দল জুটেছে, পাড়াটাকে উচ্ছন্নয় দিলে একেবারে।...এ পাড়া না ছাড়লে আর ভদ্রস্থ নেই! আমার ছেলেটার পেছনেও লেগেছে আমি কি আর জানি না—ওটাকে সুদ্ধ দলে টেনে চোর মাতাল না করতে পারা অব্দি শান্তি নেই শুয়োরের বাচ্চাদের। যেদিন দেখব ছেলের মুখে মদের গন্ধ ঐ শালার ছেলেকে কাটব, হারামজাদাদের দলের যে ক'টাকে পারি কাটব তারপর নিজেই পুলিসে গিয়ে ধরা দোব—কী করবি কর্! ও বিশ্বেসদা, শুনেছেন, সেদিন আপনি বলছিলেন না, আজ আমার কলও গেছে'

এই কাণ্ড যে হয়ে দাঁড়াবে, হারু তা ভাবেনি।

শ্‌-শালা রে! · বাবা বড় জোর বাড়িতেই খানিকটা চেঁচামেচি করবে, হা-হুতাশ করবে, আবার একটা কল কিনতে ছুটবে, এই রকমই ভেবেছিল। এর বেশী সময়ই বা কোথা ওর, সকাল ন'টায় বেরোতে হয়, তার মধ্যে বাজার করা আছে. সংসারের খুঁটিনাটি রাজ্যের কাজ, মায় চান করার আগে পাইখানা নর্দমা ধোওয়া পর্যন্ত। জমাদারনী মাসে ছ'টাকা চায়, আসে বড় জোর সপ্তাহে দুদিন, অনেকবার বলেও আসাটা নিয়মিত হয়নি, তাতেই বাবার মেজাজ চড়ে গিছল, নিজেই করে এখন— নাইবার আগে।

সুতরাং এদিকটায় এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। আজই যে এত ভোরে উঠে কলের ঐ অবস্থা দেখবে আর চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করবে তা কে জানত। আসলে মা দেখেছে ভোরে উঠে কলের মুখ নেই, বাবাকে ঠেলে তুলেছে। ইস্‌, শালার কাজটা বড়ই খারাপি হয়ে গেল। এত চেঁচামেচি ফুচুনদের বাড়ির সামনে—শুনতে কি আর বাকী থাকবে ওদের? আর ফুচুন শুনলেই নন্তু ক্যাবা তপু বিটকেল—কার শুনতে বাকী থাকবে? শালারা এবার বাড়িছাড়া করবে দেখছি।

হারুর প্রচণ্ড রাগ হ'ল বাবার ওপর। একটা আড়াই টাকা তিন টাকার কলের মাথার জন্যে এত. একেবারে না খেয়ে-দেয়ে চেঁচাবার কি আছে? হ্যাঁ, এখন ওর চেয়ে বেশী দাম হয়েছে, পাঁচ ছ' টাকাই হয়েছে, কিন্তু তোমার তো কেনা সেই মান্ধাতার আমলে!···

কাঠ হয়েই পড়ে ছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বসল। দুধ আনাটা ভোরে ভোরেই সেরে আসা ভাল। ফুচুন যায় না—শালা নবাবপুত্তুর—কিন্তু নন্তু, তপু, বিটকেল ওরা সবাই যায় দুধ আনতে। কথাটা যদি এর মধ্যেই ছড়িয়ে গিয়ে থাকে—। না, এখন ওদের সামনে পড়তে রাজী নয় হারু।

উঠে পড়ে কোনমতে লঘুক্রিয়াটা সেরে চোখে-মুখে জল দিয়েই (বাইরের কলের মুখটা খোলা, হুড় হুড় ক'রে জল পড়ে যাচ্ছে) মেজাজের মাথায় মাকে তাড়া দিল, 'কী, দুধের বোতল দেবে, না কি

অন্য বন্দোবস্ত করেছ? এর পর কিন্তু আর আমাকে বলতে পারবে না। চড়া রোদে লাইন দিতে পারব না, সাফ কথা!'

'দাঁড়া দাঁড়া। অত মেজাজ দেখাচ্ছিস কাকে!...আজ বাবুর নিজে থেকে কী ভাগ্যি ঘুম ভেঙেছে তাই! বলি অন্য দিন চড়া রোদের ভাবনা কোথায় তোলা থাকে?... দুধ এনে আমার মাথা কিনছেন যেন, আ মলো যা!...দুধ আমিই খাই, না? দুবেলা দুবাটি চা, এই তো আমার দুধের খরচ, সেটুকু না পেলেও আমার চলে যাবে!'

গজগজ করতে করতে অশ্রুকণা কার্ড থলে আর দুটো বোতল গুছিয়ে দেয়।

'কী হয়েছে কি, সকাল থেকে তোমার বর অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে কেন?'

'আমার বর তোর কে হয় রে হারামজাদা! কথার ছিরি ছাখো না! বাপের সম্বন্ধে কী উক্তি! এই তোদের লেখাপড়া শেখা! যেমন সব টুকে পাস করা হয়েছে—তেমনি তো বিদ্যে হবে। বাবা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে! তা ঠিকই তো, নইলে তোমার মতো বলদ ছেলে হবে কেন!... চেঁচাবে না তো কি করবে? তোমারই ইয়ারবগ্‌গর কাজ এ সব, তা কি আর বুঝি না! কে জানে তুই-ই হয়ত দোর খুলে দিয়েছিস! এই বাজারে একটা কলের মুখ কেনা কি চাট্টিখানি কথা! যে নিলে সে হয়ত পাঁচ-ছ' আনা কি আট গণ্ডা পয়সা পাবে বড় জোর। আমাকে তো এখ্‌খুনি আটটা টাকা বার করতে হবে। শৈলেনবাবুরা পরশু কিনে এনেছে সাত টাকা বারো আনা দিয়ে। তাও কি সে এই জিনিস!...চেঁচাচ্ছে কেন! চেঁচাবে না তো কি তোমাদের চোরের দলকে রসগোল্লা খাওয়াবে নাকি!'

কে জানে কেন হারুর মেজাজটা অপ্রত্যাশিতভাবে চুপ্‌সে যায়। সে খুব নিরীহভাবে বলতে বলতে বেরোয়, 'পেতলের কল আবার কেউ কেনে নাকি আজকাল! ও তো কেনা চোরের

জন্যেই। দুটাকা ন'সিকে দিয়ে প্ল্যাস্টিকের কল লাগালেই হয়—কেউ নিতে আসে না।'

এদিক্-ওদিক চেয়ে সে সুট্ ক'রে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

হে মা কালী, পথে ওদের কারও সামনে না পড়তে হয়! হে বাবা তারকনাথ! দেখো বাবা!

সারা দিনটা এক রকম পালিয়ে পালিয়েই বেড়াল হারু। দুপুরবেলা পাছে এসে জানলার ধারে শিস দেয় ওরা—তাই খাওয়ার পরেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

অশ্রু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'এই দুপুর-রোদে আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি! সকালের রোদের তাপে তো গলে যাচ্ছিলে একেবারে! কেন, আড্ডাটা আর একটু রোদ পড়লে শুরু করা যায় না?'

আর কিছু না শিখুক—মেয়েছেলের সব কথায় উত্তর দিতে গেলে চলে না—সংসার নির্বাহের এই বড় কথাটা হারু এই বয়সেই শিখে নিয়েছে। সে গম্ভীরভাবে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'জুতোমোজা পরে কি আড্ডা দিতে যাই নাকি, ছাখো তুমি রোজ?'

'তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা'হলে শুনিই না—আমার মাথা কিনতে!'

'মাথা যদি কিনতে পারি তখন বলব।'

এই বলে গটগট ক'রে বেরিয়ে চলে গেল।

অর্থাৎ ছেলে কোথাও চাকরি-বাকরির চেষ্টায় যাচ্ছে।

ও পাড়ার যাদুগোপালবাবুদের কী একটা বড় কারখানা আছে—তাঁর নয়, তিনি সেখানের বড় চাকুরে একজন—সেখানে ঢোকার জন্যে ও বার-দুই গিছল, তা অশ্রু জানে। যাদুগোপালবাবু তাঁর আপিসের আর একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে, 'মাঝে মাঝে আসতে হবে বাপু, হাঁটাহাঁটি করতে হবে, চোখের ওপর থাকা দরকার -এমনি, তুমি একবার আসবে আর

তোমাকে ঢুকিয়ে নেবে, তা হবে না। অত সস্তা নয় এখানে কাজ পাওয়া।' কে জানে, হয়ত সেখানেই যাচ্ছে, অশ্রু ভাবল। সুমতি হলেই ভাল, বাঁচে সে।

মা যে এই রকমই ভাববে তা হারু জানে, সেই জন্যেই মেজাজ নেওয়া। তা ভাবুক, সে তো আর মিথ্যে বলেনি কিছু। কে কী ভেবে নিচ্ছে তার জন্যে সে দায়ী নয়।

বেরোল—কিন্তু তার পর? কোথাও যাবার নেই। সারা পকেট ঝাঁট দিলে হয়ত ত্রিশটা নয়া পয়সা বেরোবে। পরশু আশা একটা আধুলি দিয়েছিল, তারই অবশিষ্ট এটা। কাল সিগারেটটা পরের ওপর দিয়ে চলেছিল, তাতেই এটুকু তবু আছে, নইলে এও থাকত না। সে অবশ্য সিগারেট খুব বেশী-একটা খায় না, তা'হলেও, সাত-আট পয়সা না ফেললে তো আর একটা সিগারেট হয় না আজকাল।

নাঃ, কোন সিনেমায় ঢুকে একটু আরাম করবে তা হবার জো নেই। বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা তথৈবচ সকলকারই। তা'ছাড়া তাদের কারুর কাছ থেকে পয়সা চাইতে হলে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। আর দেখাই যদি করবে তো এই ঠেকো রোদে বেরোবে কেন?

ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় সিনেমায় গিয়ে পড়ল। বাইরে যে 'স্টিল' ছবি টাঙানো থাকে তাই-ই দেখল অনেকক্ষণ ধরে, সেখান থেকে বেরিয়ে একটা বাস-স্ট্যাণ্ডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তাও কি একটু শান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় আছে! একটা মেয়ে খানকতক বইখাতা হাতে ক'রে বেছে বেছে ঠিক সেইখানেই এসে পড়ল, পেছনে পেছনে একটা ছেলে। ওরাও নিরিবিলিতে 'ইয়ে' করতে এসেছে, প্রেম না কি বলে যেন, এই বাস-স্ট্যাণ্ড ছাড়া ওদেরও জায়গা নেই আর।

আড়ে চেয়ে দেখল বারকতক। মজার গন্ধ পেলে থেকে যেত, কিন্তু এ তেমন নয়। ছেলেটা গোবেচারা, দেখতে ভাল—মেয়েটা

তো যেমন 'শুঁটকী' তেমনি 'কেল্‌টি'—আর গায়ে কি ঘেমো গন্ধ, তাতেই ছেলেটার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

ধ্যুস্‌! বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। কিন্তু এখনও তো শালার দুটো বাজেনি, এই খাড়া রোদে কত ঘোরা যায়? আবারও হাঁটতে হাঁটতে আর একটা সিনেমা। সেখানে খানিকটা কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। আগে ভেবেছিল একটা পান আর একটা সিগারেট কিনবে কিন্তু তাতে বসবার জায়গা মিলবে না। চা খেতে ঢুকলে চেয়ারও পাবে, মাথার ওপর একটা পাখাও পাবে। কত আর নেবে, কুড়ি পয়সাই নিক এক কাপ চা? তা নিলেও একটা সিগারেটের পয়সা থাকে তবু। চার আনা নিলে শালার ভোঁ—পাঁচ পয়সায় সিগারেট হবে না। মানে ভদ্দর লোকের খাবার মতো হবে না। ওর চেয়ে সস্তার সিগারেট যা আছে, ওর বন্ধুরা যা খায়, হারু খেতে পারে না তা। বেজায় কাশি আসে, মনে হয় গাঁজা খাচ্ছে। নেশাটা এখনও ওর এত পাকারকম হয়নি যে, ঐ সব যা-তা ছাইভস্ম খেতে হবে।

এক চুমুক এক চুমুক ক'রে খেলেও—এক কাপ চা আর কতক্ষণ চলে, এক সময় শেষ হবেই। হ'লও। তবু তো বিশেষ কিছু বলল না বয়গুলো তাই। এই দুপুর রোদে তাদেরও এত খদ্দের নেই যে, ওকে ওঠবার কথা মনে করিয়ে দেবে। বরং—কথাটা ভেবে হারু আপনমনেই এক পেট হেসে নিল—তবু একটা লোক বসে থাকলে পথের লোক ভাববে এমন সময়ও এদের খদ্দের থাকে যখন, তখন ভাল দোকান নিশ্চয়ই। এও তো একটা বিজ্ঞাপন।

তা'হলেও, এক সময় উঠতে হয়। নিজেরই লজ্জা করে। এই গরমে পাখার নিচে বসে ঘুম পেয়ে যায়। যদি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে—এরা কি ভাববে! যদি ধাক্কা দিয়ে বলে, 'ও ভাই, ঘুম পেয়ে থাকে ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে, এটা তোমার বৈঠকখানা নয়।' না কি—'আপনি' 'আজ্ঞে' করবে? বলবে, 'দাদু নিজের ঘরে

গিয়ে ঘুমোন গে।' 'আপনিই' বলবে, 'তুমি' বলতে সাহস করবে না।

কাউণ্টারে ম্যানেজার বসে ঢুলছিল। কাছে গিয়ে 'ক-পয়সা হ'ল দাদা ?' জিগ্যেস করতেই চমকে উঠল। সেই লজ্জা ভাঙতেই একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কি রে, কি দিয়েছিলি চার নম্বর টেবিলে, এই গোবে !'

গোবে ঐ মোটা ছেলেটা, খালি গায়ে চা দিচ্ছে আর বদবদ ক'রে ঘামছে। সে মুখটা বাঁকিয়ে বলল, 'খালি চা—এক কাপ।'

ম্যানেজার বিরসবদনে বললে, 'কুড়ি পয়সা।'

যাক, বাঁচা গেল। দশটা পয়সা তবু থাকবে।

সিকিটা বার ক'রে টেবিলে দিতে পাঁচ পয়সা ফেরত দিলে ম্যানেজার। সেটা পকেটে ফেলতে গিয়েও কি মনে হ'ল। গোবের মুখ-বাঁকানোটা বড্ড লেগেছে, ওর ঐ থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিলে কেমন হয় ? সিগারেট না হয় না-ই খেল ! রবীন গড়গড়ি বলে পয়সা পুড়িয়ে দেওয়া। আর একটা সিগারেট খেয়েই বা কি রাজা হবে ! সে ডাঁটের মাথায় ডাকল, 'বয়— শুনে যাও।'

'ইধার আও' বললেই ভাল শোনাত, কিন্তু নিতান্তই বাঙালীর ছেলে, ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরছে, তাকে হিন্দীতে ডাকতে লজ্জা হ'ল।

গোবে একটু অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে, ভুরু কুঁচকে। একবার ম্যানেজারের মুখের দিকে চাইল। বোধহয় ভাবল কোন ছুতোয় বকুনি দেবে। পায়ে পায়ে কাছে এসে চেষ্টাকৃত মেজাজের সুরেই বলল, 'কি ?'

হারুও মেজাজের হাসি হাসল একটু। তারপর পকেটের পাঁচ পয়সা নিয়ে দশ পয়সা ক'রে গোবের হাতে দিয়ে বলল, 'বকশিশ!' তারপর ঠোঁটে একটা শিস দেবার ভঙ্গী করতে করতে গট গট ক'রে বেরিয়ে এল ! একবার ভাবল চেয়ে দেখে মুখখানা কী রকম হ'ল ছেলেটার। কিন্তু তখনই মনে হ'ল ও ভাববে

'ভাঁড়ে মা ভবানী'—পকেট ঢু-ঢু—তাই দশ পয়সা দিয়েই ফিরে তাকাচ্ছে।

অবশ্য ফিরে দেখতে হ'ল না, নামতে নামতেই কানে গেল, 'আমার মতো কাপ্তেন বাবু! এক কাপ চা খেয়ে আবার বকশিশ! ভাবলে খুব দেখানো হ'ল! ফুঃ!'

কী বেইমান রে ছেলেটা! কে তোকে দিচ্ছে এই পয়সা শুনি! এখানে ঐ কুড়ি পয়সার চা খেয়ে কে কত পয়সা দেয়! মাঝখান থেকে একটা সিগারেটের পয়সা সম্বল ছিল তাও বেরিয়ে গেল।

মেজাজটা গেল আরও খিঁচড়ে! এখন সবে চারটে। ফিরবে নাকি? ফেরাই ভাল। এর পর সন্ধ্যের মুখে পাড়ায় ঢুকতে গেলেই দলের কারও না কারও চোখে পড়বে।

হারু বাড়ির পথই ধরল। রোদে রোদে ঘুরে মাথা ধরে উঠেছে, আর ভালও লাগছে না। দলের সঙ্গে যে দেখা করারও মুখ নেই, নইলে—তপুর একটা গগল্‌স্‌ আছে, নিয়ে এলে হ'ত।

তবু শেষ মুহূর্তে সাহস হ'ল না। পথে-ঘাটে একটু ভিড় না হলে পাড়ায় ঢোকা নিরাপদ নয়। আপিসবাবুদের ফেরার সময় হলে দলে গা ভাসিয়ে চলে যাওয়া যায়, খালি পথ-ঘাট, খাঁ খাঁ করছে, এখন দূর থেকে দেখতে পাবে শালারা। সে আরও খানিকটা ঘুরে লেকের ধারে গেল।

তাও কি একটু ছায়ায় কোথাও বসবার জো আছে! যে সব বেঞ্চিগুলো গাছের ছায়ায়—ছাখো বেছে বেছে ঠিক সেইগুলোতে হয় জোড়ের পায়রা বসে বকবকুম করছে, নয়তো কেউ টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। আচ্ছা, ওরা এত কী কথা বলে বসে বসে? শুধু কথা বলতেই এত সুখ কিসের? এখানে তো আর কিছু করা যায় না। একটা চুমুও তো খাওয়া যায় না।...তা বোধ হয় খায় ওরা! ওদের অত ভয়-ডর লজ্জা-শরম নেই। বাবা একদিন মার কাছে গল্প করছিল ছেলে ঘুমিয়ে আছে ভেবে যে,

যুদ্ধের সময় নাকি এখানে আমেরিকান সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল, তারা প্রকাশ্যেই যা-খুশি-তাই করত, লজ্জাটজ্জার বালাই ছিল না। কত বাঙালীর মেয়েও তখন আসত লেকে— পয়সার লোভে। ...ইস! তখন যদি জন্মাত হারু! কত মজা দেখতে পেত। হয়ত কত মজা লুটতও।

অনেক খুঁজে একটু নিরিবিলি একটা বেঞ্চি পাওয়া গেল ছায়ায়। গুলমোহর গাছের ছায়া, তা হোক—মোটামুটি রোদটা আড়াল হয়েছে।...আঃ! হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে বসল একটু, বসে বাঁচল। রোদটা বড্ডই চড়া। ঘামে সমস্ত শরীর জবজব করছে। আর এই শালার এক হয়েছে টেরিকটের জামা! বাবাকে খেচ্‌কে খেচ্‌কে আদায় করে বটে, নিমুদাও দেয়— কিন্তু কোন আরাম নেই। বড্ড ঘাম হয় পরলে। নেহাৎ সবাই পরে বলেই পরতে হয়, নইলে খেলো হয়ে যেতে হয় ওদের কাছে। আর টেঁকেও অনেক দিন। তবে এত টেঁকা ওর পছন্দ নয়, না ছিঁড়লে তো আর নতুন জামার তাগাদা দেওয়া যায় না!

বসে এটা-ওটা ভাবতে ভাবতে তারও ঝিমুনি এসে গেল একটু। একবার ভাবল ঐ ওদের মতো শুয়েই পড়ে সোজাসুজি। পকেটে তো নেংটি ইঁদুর নামালেও একটা কানাকড়ি কেউ বার করতে পারবে না, পকেটমারা যাবে সে ভয় নেই। কিন্তু কেমন লজ্জা করল। যা হয় বসে বসেই ঢুলবে। তাতেও মাথাটা ছাড়তে পারে।

ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়েই পড়েছিল বেশ, চমক ভাঙল একটা প্রচণ্ড 'ফোঃ' শব্দ ক'রে বিরাট লোক একজন পাশে এসে বসতে। ইস, কত ওজন হবে রে শালার! বেঞ্চির কাঠটা নৌকোর মতো বেঁকে গেল। তেমনি রুমালও বার করল বটে একখানা—ঘাম মোছবার জন্যে! পুরো একটা বাজার করা ঝাড়ন।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখল, রোদ বেশ পড়ে এসেছে। মানে সূর্যও দেখা যাচ্ছে না, শুধু পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে আছে

এখনও। তার মানে ছ'টা বেজে গেছে নিশ্চয়। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তো বসে বসে! পিঠটায় ব্যথা হয়ে গেছে একফালি তক্তায় একভাবে ঠেস দিয়ে। কিন্তু মাথাটা ছেড়েছে। বেশ ভাল লাগছে এখন।

সে উঠে বাড়ির পথ ধরল এবার। ভীষণ ক্ষিধে। পেটে যেন মোচড় দিচ্ছে। বাড়ি গিয়ে কিছু খেতে না পারলে চলছে না।

কিন্তু ঐ যে একটা কথা বলে না মা, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়'—আজ সেটার মানে পরিষ্কার বুঝল।

আসলে, ঘুমিয়ে উঠে বেমালুম সব ভুলে গেছল। মাথার ওপর যে খাঁড়া ঝুলছে—খেয়ালই ছিল না!

রোদ পড়েছে, গরম অত নেই, হাঁটতে ভাল লাগছে—জোরেই হাঁটছিল। লক্ষ্যটা ছিল কতক্ষণে বাড়ি পেঁছিবে। চা আর যা হয় কিছু, মুড়ি কিংবা বরাত ভাল হয় তো একখানা দুখানা পরোটাও মিলতে পারে। সেই জন্যেই—পাড়ায় ঢোকবার মুখে যে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে চলা উচিত ছিল—সে হুঁশটা হয়নি। বেশ হন হন ক'রেই যাচ্ছিল। ঠিক ক্যাবাদের দোকানের মুখে খাঁজমতো জায়গাটা—যত নোংরা ফেলে ঐ সেলুনের লোকগুলো, আর ফলওলারা—ফলের ঝুড়ির পাতা-খড়—সেইখানে আসতেই খপ্ ক'রে ধরল ফুচুন।

'এই শালা! সারা দিন কোথায় ছিলে চাঁদ! ভাবছ পালিয়ে বেড়ালেই আমাদের হাত এড়াবে? বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবি রে?···ভাত বাঁধা না এখানে? কোথায় কোন্ শ্বশুরবাড়ি করেছিস যে গা-ঢাকা দিবি?'

'নে ছাড়! জরুরী কাজ আছে। মা পাঠিয়েছিল এক জায়গায়, মাসীর অসুখ তার খবর নিতে—ভাবছে এতক্ষণ।'

'ত্যাখ হেরো, মিথ্যে কথার চ্যাঙাড়ি ওলটাসনি বলে দিলুম। ওসব আমরা জানি! শালা এসো না একবার আড্ডায়, আধখানা

মাথা মুড়িয়ে যদি রাস্তায় না ঘোরাই তো কি বলেছি!…শালা কাওয়ার্ড কোথাকার! শেষে আর কোন বাড়ি যেতে সাহস হ'ল না, নিজের কল নিজে চুরি করলি! তুই কি মানুষ না হারামীর বাচ্ছা? উল্লুকা পাটঠা বলে মেড়োরা—তুই তাই!'

'কে বলেছে নিজের কল নিজে চুরি করেছি? তোরাই কে ঝেড়েছিস!' বলে, কিন্তু গলায় তেমন জোর ফোটে না।

'এক থাপ্পড় মারব ফের যদি রোয়াবি লিবি! তোর কাল কল চুরি করার কথা ছিল—কোথায় কাব কল চুরি করেছিস শুনি?'

'এ পাড়ায় করব নাকি? বস্তিপাড়ায় হারান সেনের বাড়ি—'

'চ শালা হারান সেনের বাড়ি। দেখে আসি কেমন কল সাফাই করেছিস! তোর কলটাই বা কোথায় রেখে এসেছিস বল্, দেখি মিলিয়ে।—আমার কাছে ওস্তাদি মারতে এইছিস! তোর কতটুকুন বুকের পাটা আমি জানি না? নিজের পাড়ায় কিছু করতে পারিস না, আমরা রাস্তা পাহারা দিই তবু—তুই যাবি বস্তিপাড়ায় কল চুরি করতে লাইন ডিঙিয়ে! পাহারাদার আছে, কুকুর আছে নিদেন এক কুড়ি। কার কাছে এসব খাপ খুলছ চাঁদ?'

মুখ শুকিয়ে গেছল বৈকি হারুর।

মা কালী বাঁচিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময় একটা ট্রেন এসে পড়ল। প্যাসেঞ্জারের ভিড়—ফুচুনকে বাধ্য হয়ে ভদ্র হতে হ'ল। সেই ফাঁকে—'ছাড়, কাজ আছে' বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড়ে মিশে গেল হারু। ওর পাশের বাড়ির ক্ষিতীশদাকে দেখেও একটু ভরসা বাড়ল। ঠিক পেছনে পেছনে তার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে যেতে পারলে আর ফুচুন এসে টানাটানি করতে সাহস করবে না।

॥ ২ ॥

সেদিন বেস্পতিবার, একদম মনে ছিল না। বাড়ি ঢুকে দেখলে এদিকের দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে মা পূজোয় বসেছে। নিজের আহ্নিক করবে, লক্ষ্মী-পূজো, পাঁচালী পড়বে—যার নাম এক ঘণ্টা। খাওয়ার তো বারোটা বাজলই, বড় কথা যেটা—এখন যায় কোথা? ফুচুনের দলের তাড়না আর ধিক্কার থেকে রক্ষা পেতে পারে, এমন একটা জায়গাও মনে পড়ল না। তার চেয়ে ছাদে ওঠা ভাল। সে জুতোটা খুলে আস্তে আস্তে সেলাইয়ের ইট বেয়ে ছাদেই উঠে গেল।

ছোট্ট বাড়ি তাদের, ছোট ছোট দুটি কামরা। এপাশে সিঁড়ি বাথরুম হবে প্ল্যান ছিল, কিন্তু জ্যাঠা আলাদা হয়ে যেতে আর হয়ে ওঠেনি। জ্যাঠার অংশের দাম দিতেই বাবার জিভ্ বেরিয়ে গেছল। কিন্তু মিস্ত্রি যখন বাড়ি করে তখন প্ল্যানমতোই করেছিল, ভবিষ্যতে এদিকে দেওয়াল গাঁথা হবে বলেই ইটের সেলাই রেখেছিল। সে মতো আর করা যায়নি, বাকি অংশটুকুতে তিন ইঞ্চির দেয়াল দিয়ে টিনের চালের ঐ ঘরটুকু ক'রে দিতে হয়েছে। ভাড়া না দিলে চলবে না বলেই নাকি এই ব্যবস্থা। কতক তো সাশ্রয় হয়েছে!—নিমুদা হিসেব ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে, কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে করা, ভাড়া ছত্রিশ টাকা পায়—তা ঐ কো-অপারেটিভের কিস্তিতেই চলে যায়। আজ অব্দি এক পয়সাও ও টাকা থেকে খরচ করতে পারেনি। এদিকে তো মেরামতের সময় হয়ে এল। দেনা শোধ হলেই আবার ধার করতে হবে।

মাঝখান থেকে ভাড়াটের এই ঝঞ্ঝাট। প্রহ্লাদবাবু, তার বৌ আশা, বুড়ী শাশুড়ী—দুটো বাচ্চা। কল-পায়খানা নিয়ে নিত্য আতান্তর, অশান্তি। আর মায়েরই কি কম কষ্ট, পেছনে যে দশ

ফুট জায়গা ছাড়ার কথা, তাতেই একখানা করোগেট টিন ফেলে রান্নাঘর করে নিতে হয়েছে, গরমের দিনে সেদ্ধ হয় মা বসে বসে, হাঁড়ির ওপর সরা চাপা দিয়ে ভাপে সেদ্ধ করার মতো। ওপরের টিন তেতে আগুন, নিচে উনুন। ঐটুকু ঘরে—জানলা বলতে একটা একফুট বাই দেড়ফুট, তাতে হাওয়াও ঢোকে না, তাপও বেরোয় না। ও ঘর নাকি পাকা করার উপায়ও নেই, আইনে আটকাবে। এতেই কর্পোরেশনের ইনস্‌পেক্টরকে মাঝে মাঝে দু-একটাকা পান খাওয়াতে হয়।

তাও, মা বলেছিল, এমনিভাবেই একটু ঘিয়ে নিয়ে আলাদা বাথরুম করার কথা - বাবার ধকে কুলোয়নি। দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে আছে। এমনিতেই তো একজন কিছু কিছু গোঁজে বলে তবু চলছে।

থাক। কথাটা মনে হলেই মাথার মধ্যে আজকাল যেন আগুন জ্বলে ওঠে হারুর।

আশা বৌদি ইশারা ক'রে ডাকছে।

ইট বেয়ে ওঠার সময়ও ইশারা করেছিল, দেখেও দেখেনি। একবার প্যাণ্টের ডগাতেও টান দিয়েছিল বোধ হয়। অন্যদিন হলে এ সুযোগ ছেড়ে দিত না। এমনিতেও অনেক দিন কিছু হয়নি তাছাড়া পয়সার খ্যাঁচও খুব, সত্যিসত্যিই যাকে বলে একটা পয়সাও না থাকা, সেই অবস্থা হয়েছে ওর। আশার কাছে গেলে যা হোক কিছু মিলত। নিদেন গণ্ডা আষ্টেক পয়সাও। চাই কি একটা টাকাও দিতে পারত। এমন সুযোগ আশার বড় একটা মেলে না। এক ঘর এক দোর, তার মধ্যে মা, ছেলেমেয়ে, বর। সন্ধ্যের সময় যা ঐ মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বেরোয় ; প্রহ্লাদবাবুর কারখানার কাজ, ওভারটাইম পেলেই আনন্দ, সকাল সাতটায় খেয়ে বেরিয়ে যান, ফিরতে প্রায়ই ন'টা সাড়ে ন'টা বাজে ; এই সময়টাই একটু যা নিরিবিলি। তাও অন্যদিন হারুর মা থাকে হারুও কোনদিন এমন সময় বাড়ি আসে না।

আজ দৈবাৎ এ যোগাযোগ হয়েছে বলেই আশা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, কে জানে কেন—হারুর আজ আর ভাল লাগল না। বেস্পতিবার, লক্ষ্মী-পূজো হচ্ছে—ধ্যুস! সে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসল—যেন শুনতে কি দেখতে পেল না।

এ বিরক্তি বা বীতরাগ কেন তা হারু নিজেও জানে না। মাথাটা ওর কোনদিনই খুব সাফ নয়, গুছিয়ে কিছু ভাবা বা গভীরভাবে অনুভব করার মতো তো নয়ই। এই কল চুরির ব্যাপার নিয়েই আজ মনের মধ্যে কোথায় একটা ধিক্কার জেগেছে; তার চেহারাটা জানা নেই বলেই বুঝতে পারছে না, সে আত্ম-ধিক্কারটা পৃথিবীর সব কিছুর ওপর বিরক্তির আকারে প্রকাশ পাচ্ছে।

লেপাপড়ার শক্তিও ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। এ নাকি ওদের বংশেরই নেই। হারুর মা অশ্রু প্রায়ই স্বামীকে গঞ্জনা দেয়, বলে, 'তুমি আর মুখ নেড়ো না। তোমার দাদা তবু ছেলেবেলায়ই বুঝেছিল, সময় থাকতে ইস্কুল ছেড়ে কারখানায় ঢুকে কাজ গুছিয়ে নিলে। কত অল্প বয়েসে বিনা বিদ্যেয় ছাখো অত বড় কারখানার ফোরম্যান হয়ে বসে কত বড় বাড়ি ক'রে নিলে বালিগঞ্জে, ছেলেমেয়েদের মিশনারী ইস্কুলে রেখে পড়াচ্ছে। বৌ ভাল তাঁতের শাড়ি ছাড়া পরে না। তুমি কি করলে! কোনমতে—তাও একবার ফেল ক'রে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস, তবু ভাগ্যিস আমার মেসো ছিল তাই এই চাকরিটুকু জুটেছিল! পড়াশুনো হবে না জানতেই তো—দাদার মতো কারখানায় ঢুকলে আজ পায়ের ওপর পা দিয়ে আরাম করতে পারতে। এ কী হ'ল? দুয়ের বার নৈরেকার!'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তুমি আবার ছেলেকে বল কি? তোমারই তো ছেলে। আমড়া গাছে আবার ন্যাংড়া ফলেছে কোন্ কালে বলো! যেমন তুমি তেমনিই তো হবে। তোমার তবু লোক ছিল ধরবার, আমার শাশুড়ি ঠাকরুন ছিলেন, গি-

মেসোর পায়ে পড়েছিলেন। মেসোরও তখন আমার বে-র চিন্তে—চাকরি তাই একটা হয়ে গেল। শালীঝি গলায় আটকেছিল, নামিয়ে নিশ্চিন্তি হ'ল!…তোমার ছেলের হয়ে কে ধরছে বলো, কাকেই বা ধরবে—আর এখন সে দিনও নেই যে, মুখ্খু ছেলেকে মেয়ে দেবার জন্যে চাকরি কবলাবে। খাবে-দাবে দাগা-ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াবে, এ-তো আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি!'

এইসব সময়গুলোয় রাখালবাবু কথা বলতেন না। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এমনি একটা উচ্চাঙ্গের ভাব ক'রে ভুরু কোঁচকাতেন শুধু।

হারুর যে লেখাপড়া হবে না, তা সবাই জানত। হারু তো জানতই, তার মা, রবীন মাস্টার, পাড়া-পড়শী সবাই জানত। রাখালবাবু তার মতো বুঝদার হলে হারু অনেকদিনই ও পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্তি হতে পারত। কিন্তু রাখালবাবু কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। একটা পাস না করতে পারলে নিদেন—সোজাসুজি বিড়ি পাকাতে হবে, এই ছিল তাঁর যুক্তি। লোকে আড়ালে বলত, 'এঁড়ে গোরু না টেনে দো।' যার লেখাপড়া হবে না—সে পাস না করলে কী করবে, এ চিন্তায় ফল কি বলো!

তাও ভাগ্যে রাখালবাবুর শেষ পর্যন্ত একটু সুবুদ্ধি হয়েছিল। আগে হায়ার সেকেণ্ডারীই পড়ছিল, ক্লাস এইটেই একবার ওদের ভাষায় 'গাড্ডা মারতে' তাঁর চৈতন্য হ'ল, তিনি ইস্কুল ফাইন্যাল ক'রে দিলেন। তাতেই কোনমতে থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে।

অবিশ্যি কোনমতেই যে কি তা হারুই জানে। এঁরাও যে একেবারে আঁচ না করেছেন তা নয়। রাখালবাবু বোধহয় ভালভাবেই বুঝেছেন। হারু আড়ালে বন্ধুদের কাছে যা বলে তা ওর আন্তরিক বিশ্বাস, 'বাবাটা মাইরি খুব চালাক। মিচ্‌কেপোড়া শয়তান যাকে বলে না-তাই। পেটে পেটে অনেক কিছু খেলে—মুখে অমনি কুলুপ এঁটে থাকে—কোন কথায় রা কাড়ে না। জানে কথা বললেই ট্যাক্স দিতে হবে, বোবার শত্তুর নেই।'

পাশ করেছে ঐ ফুচুনদের দলের কল্যাণেই। খুব মেহনত করেছে ওরা। নইলে এ পাড়ার একজনও পাস করতে পারত না। ঐ তো অত ভাল ছেলে ভাস্কর—পাঁচটা টাকার জন্যে মেজাজ দেখালে, বললে, 'নিজের জোরে যদি পাস করতে না পারি, ফাঁকি দিয়ে ও সার্টিফিকেটটা নিয়েই বা লাভ কি বল! এর পর তো আর তোরা দেখতে আসবি না, ক'রে খেতে হবে তো আমাকেই।' কী হ'ল ফলটা? তাকেও তো ওদের সঙ্গেই সেই থার্ড ডিভিশনে যেতে হ'ল!

মাথা আছে ফুচুনদের এটা ঠিক।

সুতোর এক কোণে ঢিল বেঁধে পটাপট ছুঁড়েছে হলের জানলা দিয়ে, সে সুতোর আর একদিকে দেশলাইয়ের খালি খোল বাঁধা একটা ক'রে। ঢিল ধরে সুতোটা টেনে তুললেই বাক্সটা আসবে। তার মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর লেখা।

উত্তর লেখা, চার-পাঁচটা ক'রে কপি করা ঐটুকু সময়ের মধ্যে —খাটুনিও কম নয়। চার হক্কে পাঁচ টাকা কিছুই নয়। নেহাৎ এরা এর বেশী দিতে পারবে না বলেই বেশি কামড় করে নি। তাছাড়া ওদেরও খরচা আছে বৈকি, গার্ড শালাদের ভয় দেখালেই চলে—এমনিই শালারা আসে শুকনো মুখে কাঁপতে কাঁপতে—কিন্তু উত্তর যারা লিখবে—রতন, রাজু, তপু—ওদের ভয় দেখালে হয় না। ওদেরও দল আছে। তাছাড়া ভয় দেখালে লিখতে পারে কিন্তু ঠিক লিখছে কি ভুল লিখছে সে বুঝবে কে? সবটাই তাদের হাতে। তাদের সিগারেট খাওয়াতে হয়, সিনেমা দেখাতে হয়। ফুচুনদের নিজেদেরও খরচা আছে। এই ফাঁকে যদি এক-আধ দিন মাল খেতে না পারে—আর কবে খাবে; ইস, যে ক'রে পাঁচটা টাকা কায়দা করতে হয়েছিল মার কাছ থেকে তা হারুই জানে। তবে মা ঠিক বুঝেছিল, জেনে-শুনে ন্যাকার ভান করেছিল, তাই।

তারপর আর লেখাপড়া হয় নি হারুর। আর হওয়া সম্ভব নয় সে সহজ সত্যটা রাখালবাবুও মেনে নিয়েছিলেন, হারুও ও-বালাই চুকিয়ে নিশ্চিন্তি হয়েছিল। ওর মায়েরই ভাষায়—তারপর থেকে 'দাগা ষাঁড়ের মতো' ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনকার রেওয়াজ মতো চোস্ত সর্বাঙ্গ দেখানো প্যান্ট, খাটো শার্ট, জুলফি আর ঝাঁকড়া চুল। কমতি কিছুই নেই।

স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভাল—সেটা ওর সম্পদও বটে, বিপদও বটে। ফুটবল খেলতে পারে ভাল। এখনও খেলে কিন্তু ক্লাবের চাঁদা দিতে পারে না বলে কোন টুর্ণামেন্টে খেলতে দেয় না তারা। চাঁদাও কম নয়, এক সীজন্-এ পাঁচ টাকা। তার কম নাকি হয় না, টুর্ণামেন্টে নাম লেখানো যায় না। অথচ রাখালবাবু সাফ বলে দিয়েছেন, 'হ্যাঁ, পেটের ভাত যোগাতে পারি না, ছেলের ফুটবল ক্লাবের চাঁদা যোগাবো। ওসব হবে-টবে না। যা হয় তো একটা পাস করেছে—টিউশনীও তো ধরতে পারে—নিচের ক্লাসের ছেলেদের পড়াবার যুগ্যিতাও কি নেই? তাও তো একটা ধরলে পারে, তাতেও তো মাসে দশ-পনেরো টাকা আসে। খেলার চাঁদা, বাবুর ধোঁয়ার খরচ—এটা তো হয়। আমি আর কত টানব?'

কথাটা যে ন্যায্য তা হারুও মানে। কিন্তু কে এত নিচের ক্লাসের টিউশনী নিয়ে বসে আছে তার জন্যে, সেটাও তো বুঝতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, বাবাকে বোঝাতে পারে না। দু-একবার বলতে গেছে, বাবা খিঁচিয়ে উঠেছে, 'হ্যাঁ, সবই আমি হাতের কাছে যুগিয়ে দোব, উনি খেয়ে কেদাত্ত করবেন!' আরও মায়ের কাছে যা বলেছে তাও আড়াল থেকে শুনেছে হারু। ওর বাবা এখনও এত কাঁচা খিস্তি করতে পারে—জানত না ও। ফুচুনদের দলকে হার মানিয়ে দেয়। কথাগুলো শোনার পর থেকে অনেকটা যেন বুকের বল বেড়েছে ওর।

না, টিউশনী পায় নি। কারণ ওদের, ওদের ঠিক ওপরের যে বিরাট দলটি বসে আছে, তাদের সকলেরই বিদ্যে ওর মতো—রবীন

মাস্টারের ভাষায় 'তথৈবচ'। সবাই খোঁজে, নিচের ক্লাসের ছেলেমেয়ে। আর গার্জেনরাও হয়েছে তেমনি সেয়ানা, মাস্টার রাখে বেছে বেছে ইস্কুল মাস্টার দেখে, যাতে পরকালের কাজ হয়, মানে বছরের শেষে পাস করা না আটকায়। ওপরের ক্লাসে প্রাইভেট টিউটর রাখার ক্ষমতা তাদের পাড়ার কারও নেই, সবাই কোচিং ক্লাস খোঁজে। রবীন মাস্টারেরই জয়জয়কার—নাইবার খাবার সময় নেই। নইলে টিউটার রাখতে গেলে ইংরিজীর অঙ্কের বা সায়ান্সের আলাদা আলাদা মাস্টার রাখতে হয়। খুব কম ক'রেও দেড়শোর ধাক্কা মাস গেলে!

কাজেই বাধ্য হয়ে ফুটবল খেলা ছাড়তে হয়েছে। এখন স্রেফ নিছক আড্ডা। কোনদিন কোন খেলায় লোক কম পড়লে ওকে ডেকে নিয়ে যায়, কোন লীগে কি শীল্ডে ভাল টিমের সঙ্গে খেলা পড়লেও ডাকে ওকে। ব্যাকে ও ভালই খেলে নাকি। তাছাড়া ওর আরও গুণ আছে। 'বাচ্চু মেমোরিয়াল শীল্ডে' হারাধনশ্রী ক্লাব যা মারপিট ক'রে খেলেছিল তাতে হারু না থাকলে দশখানি গোল খেয়ে আসতে হ'ত বাছাধনদের। এ তবু মানে-মানে ড্র দিয়ে আসা গিছল। হারু মারপিট করতে পারে না কিন্তু মার খেতে পারে। মার খেয়ে গায়ে অন্তত দশ জায়গায় কালসিটে পড়ে গিছল, তবু ওকে শোয়াতে পারে নি রসিদনগরেব ঐ আধা গুণ্ডার দল।

এত করে হারু—বিপদে পড়ে ডাকলেই ছুটে যায়—মান-অভিমানের বালাই নেই--তবু চাঁদা না দেওয়ার জন্যে, দশ কথা শোনাতেও ছাড়ে না ওরা। আর এমনি মাঠের ধারে এলেই গলা উঁচিয়ে শোনায় কাবির দাদা, 'আউট-সাইডারস্ আর নট য়্যালাউড, সবাই হুঁশিয়ার থেকো, ক্লাবের বাইরের লোক না ঢুকে বল পেটে!'

ঐ ঘেন্নাতে আজকাল মাঠের ধারে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে।

তা হোক, এত দিনের খেলার ফলে দেহটা গড়ে উঠেছে। এমনি দেখলে মনে হয় ছিপছিপে কিন্তু পায়ের দিকটা, পাছাটা খুব

ভারী, মেয়েরা যেমন পছন্দ করে। এ ওর মনগড়া কথা নয়—এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে ইতিমধ্যেই। ওর দলের কেউ জানে না, কাউকে নিয়ে এত টানাটানিও হয়নি বোধ হয়। রাখালবাবু যা ভাবেন ততটা ও নয়—একেবারে কোন ব্যাপারেই যে—তাঁরই ভাষায়—'যুগ্যিতা' নেই, তা ঠিক নয়। কোন কোন বিষয়ে সে বাবার থেকেও অভিজ্ঞ বোধহয়, অন্তত তাঁর সাহায্যের অপেক্ষায় বসে নেই।

সে কি আজকের কথা!

তখন ও সবে 'এইট'-এ পড়ছে, অবশ্য এইট-এর দ্বিতীয় বছর সেটা, ইস্কুলে যা-ই লেখানো থাক—ওর তখন ষোল বছর চলছে, ওদেরই গলির মোড়ে নারাণ দত্তর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার (নারাণ দত্ত 'আমার বৌ' বলে না, বলে 'আমার পরিবার')—ওরা কাকীমা বলত, বলত কেন—এখনও বলে, তিনিই ওকে পাকিয়ে দিয়েছেন—নিমুদা ঐ যে বলে না, 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া'—তাই খাইয়ে দিয়েছেন।

কে জানে যে তাঁর এই মতলব, হারু কিছুই জানত না, বুঝত না, অন্তত এদিকটা বুঝত না—খেলাই ছিল ওর সব. দলে পড়ল এই খেলার লোভেই; ওদের ছাদে ওঠার অসুবিধে তায় নেড়া ছাদ, আলসে নেই, তবু ঘুড়ি যখন ওড়াতেই হবে তখন অত ভাবলে চলে না, নিজেদের ঐ ছাদেই ওড়াত। মিলি কাকীমা তাঁদের ছাদ থেকে কোনদিন দেখে থাকবেন, তারপর ওঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় নিত্য বলতে শুরু করলেন, 'তোদের ঐ ন্যাড়া ছাদে অমন ক'রে ঘুড়ি ওড়াস কেন রে, আমাদের এত বড় দিগধাউড়ে ছাদ পড়ে আছে—এখানে এলে তো পারিস!'

প্রথম দিন ঐ—তার পর থেকে দুবেলা বলতে শুরু করলেন, 'কই এলি না ঘুড়ি ওড়াতে? আসিস না!'

বাড়িটা ওঁদের খালি পড়ে থাকে সত্যিই। নিচের তলায় ভাড়াটে আছে, তারা ছাদে ওঠে না, সিঁড়ি তাদের নয়। এঁরাই

সোজা সদর দরজা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠেন, সেখান থেকেই ছাদে যাবার সিঁড়ি। বুড়ো নারাণ দত্ত সারাদিন ধরে হয় নিজের সদরে নয় তো ডাবুদের রকে বসে তামাক খান আর দুনিয়ার লোক ধরে বাজারের হিসেব নেন, কে কি কিনেছে, কত দর। আর থাকার মধ্যে কাকীমার মেয়ে অরুণা—তা সে বোধ হয় রাত্রে শোবার সময় ছাড়া বাড়ি থাকে না কখনও। সমস্ত দিন কোথায় কোথায় যে ঘোরে তা ভগবানই জানেন। ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে কলেজে ঢুকেছিল এই পর্যন্ত জানে সবাই। তার পরের খবর কেউই রাখে না, বোধ হয় ওর বাবা-মাও না। একখানা চটি খাতা হাতে ক'রে বেরোয়—তার পর পায়ে একেবারে পাখা গজায় বোধ হয়। কোথায় না দেখা গেছে ওকে, কোনদিন নগেনদার সঙ্গে প্ল্যানেটোরিয়ামে, কোনদিন বিজনের সঙ্গে সিনেমায়, কোনদিন বা এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে খিদিরপুরে, কিংবা আর কারও সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। এ পাড়ার তো কাউকে বাকী নেই বোধ হয় যজাতে। এখন নাকি একটা বামুনের ছেলেকে বিয়ে ক'রে ঘরের বৌ সেজে বসেছে।

সে যাক গে। এই মেয়েরই মা, এখন হ'লে বুঝে সাবধান হ'ত। ত্রিসীমানায় যেত না ও বাড়ির। কিন্তু তখন এসব কিছুই জানত না। সবে দু-একজন ক্লাস ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে—পাঠ নিচ্ছে মানে তারা বলে ও অবাক হয়ে শোনে, আদ্ধেক কথা বোঝে না, বোঝার ভান করে বোকা সাজবার ভয়ে। অনেক দিন বলার পর একদিন বিকেলে গিছল ঘুড়ি ওড়াতে। দিগধাউড়ে ছাদ এমন কিছু নয়—আড়াইখানা মাঝারি ঘর, কল-পাইখানার ওপর যতটা ছাদ হ'তে পারে—তবু হারুদের ছাদের চেয়ে বড় এটা ঠিক। মনের আনন্দে ঘুড়ি উড়িয়েছে অনেকক্ষণ ধরে, আল্‌সে দেওয়া ছাদ, পড়ার ভয় নেই, আরও নিশ্চিন্তি। শেষে—সন্ধ্যে হয়-হয়, কোচিং ক্লাসে যেতে হবে মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি লাটাইয়ে সুতো জড়াতে জড়াতে 'নেমে যাচ্ছি, কাকীমা, দোর দিন' বলে চলে যাচ্ছে, মিলি

কাকীমা ডাকলেন, 'ওকি রে, চলে যাচ্ছিস কি রে, শোন শোন, কী রকম ঘুড়ি ওড়ালি শুনি, আয়, আয়— এখানে আয়। শুনে যা—'

অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে ঘরে ঢুকতে হ'ল: বাইরে দিনের আলো যেটুকু বা আছে, ঘরের ভেতর বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে তখন, হঠাৎ ছাদের আলো থেকে এসে বুঝতেই দেরি হ'ল—মিলি কাকীমা কোথায়। একেবারে কাছাকাছি এসে দেখল একখানা-ইঁট-দিয়ে-উঁচু-করা খাটের ওপর বসে পা দোলাচ্ছেন।

সেখান থেকে ওর হাত ধরে কাছে টেনে নেওয়া এক লহমার ব্যাপার।

'ভাল লাগল ঘুড়ি ওড়াতে এ ছাতে? বেশ বড় ছাত, না? আসিস না, যেদিন খুশি আসিস। ক'খানা ঘুড়ি কাটলি ···ও মা. একি হয়েছে রে, ঘেমে যে নেয়ে উঠিছিস একেবারে! দেখি, দেখি—'

একেবারে বলতে গেলে কোলের মধ্যে টেনে এনে নিজের আঁচল দিয়ে ঘাম মোছাতে লাগলেন। মুখ গলা, গেঞ্জির মধ্যে দিয়ে বুক পিঠ—

অস্বস্তি বোধ হ'লেও সরে আসার উপায় ছিল না। এমনভাবেই এক হাতে চেপে ধরা ছিল।

এক কথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নাবালক ঢুকেছিল ও বাড়িতে, সাবালক হয়ে বেরিয়ে এল দশ মিনিটের মধ্যে।

তারপর অবশ্য বেশী যায় নি। মিলি কাকীমার পেড়াপীড়িতে আর দুটো-তিনটে দিন গিয়েছিল—বড় জোর। কেমন যেন খারাপ লাগত, গা-ঘিনঘিন করত। কেন যে করত তা জানে না। নতুন অভিজ্ঞতার মোহ তো পেয়ে বসবারই কথা, নেশা ধরাবার। কিন্তু হারুকে তেমন টানতে পারে নি। আরও ওবাড়ি যাওয়া বন্ধ করল অরুণার জন্যে। সেও টানাটানি করতে চায় দেখে—গলির ও-মুখ দিয়ে যাতায়াতই বন্ধ ক'রে দিলে কিছুদিন।

ও-ই প্রথম। তারপর এমনিই এক-আধবার লুকিয়ে চুরিয়ে—সবক্ষেত্রেই কিন্তু আকর্ষণটা এসেছে ওপক্ষ থেকে। আগ্রহ ও উদ্যম ওপক্ষেরই বেশী।

তারপর এই এক আপদ একেবারে বাড়িতে এসে জুটল। আশা বৌদি।

যেটা কৃতিত্ব বলে ভাবতে পারত, সেটা ওর বিপদ বলে মনে হয় এখন।

ভগবান ওকে বিদ্যা দেন নি বুদ্ধি দেন নি ; লেখাপড়ায় মাথাও নেই মনও নেই—কিন্তু শরীরটা দিয়েছেন। শরীর আর স্বাস্থ্য দুই-ই। শুনেছে শুধু এই মূলধনেই অনেকে জীবনে অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু ঐ শোনা পর্যন্তই। ওর কপালে সে সুযোগ আসে নি এখনও। হয়ত আসবেও না কোনদিন। ওর এই পর্যন্তই ইতি। এই পেল্লাদ পালের বৌ। এই গরমে টিনের-চাল-তিন-ইঞ্চির-দেওয়াল একখানা ঘরে ভাড়া থাকে ; নিজে, বৌ, দুটো ছেলেমেয়ে, শাশুড়ী। চল্লিশ টাকার বেশি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই এতেই মাথা গুঁজে থাকতে হয়। সামনের দু'হাত চওড়া রোয়াকেই রান্না করা, সেইখানেই বুড়ী শাশুড়ী শোয়। বুড়ীরও তেমনি—তিন কুলে বোধ হয় কেউ নেই। সারা দিন ভূতের মতো পরিশ্রম করে—ঠিক চারটেয় ওঠে, নইলে কলের জল নিয়ে অসুবিধে হবে—শুতে যায় রাত বারোটায়। পেল্লাদের ফিরতে প্রায়ই রাত সাড়ে ন'টা বেজে যায়। তাও এসে আধঘণ্টা শুয়ে থাকবে। তারপর উঠে চান করবে, খাবে—যার নাম রাত এগারোটা। তারও পরে, বুড়ীর খাওয়া সেরে বাসনকোসন গুছিয়ে রেখে শুতে শুতে বারোটা বেজে যায়। তার ওপর যদি বর্ষা নামে তো কথাই নেই। অল্প ছাটে কাপড় টাঙিয়ে চলে—বেশী হ'লে ঘরে গিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের তক্তপোশের নিচে সেঁধুতে হয়। সেখানে মশারি খাটানোর সুবিধে নেই। সারাক্ষণ গা-চাপড়ানো ছাড়া গতি থাকে না।

এই রকম মা পেয়েছিল বলেই আশা বৌদির হাতে দেদার সময়। দিনরাত ফিটফাট থাকে। খুব একটা ভাল নয় দেখতে। তবে নেহাত অচলও নয়। চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, চুলও এক পিঠ—মা বলে এক ঢাল চুল—দেহের গঠন ভাল। তার দিন কাটে না বলেই ফাঁক পেলে হারুকে দিয়ে সাধ মেটাতে চায়। প্রথম প্রথম হারুরও খুব একটা খারাপ লাগত না। বিশেষ এদিক দিয়েও সুবিধে হ'ত। হ'ত কেন, এখনও হয়। এটা-ওটা জিনিস আনানোর ছুতোয় বেশী পয়সা হাতে গুঁজে দেয়, সবাইকে শুনিয়ে বলে 'অত দিলুম।' প্রথমটা হারু বুঝতে পারত না অত, ঠিক ঠিক পয়সা ফেরত দিয়ে দিত হিসেবমতো। একদিন এখো গুড় আনতে দেবার নাম ক'রে বাটির সঙ্গে দু'খানা এক-টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিল, 'আড়াই শো গুড় নিস, এই এক টাকা দিলুম।' সেদিন খুব বুদ্ধিমান সাজতে গিয়ে হো-হো ক'রে হেসে বোকার মতো বলেছিল, 'ও কি বৌদি, খুব ঘরকন্না করো তো তুমি! এমনিই রোজদিন করো না কি? এ তো দু'খানা নোট দিয়েছ!'

সেদিন আড়ালে খুব বকেছিল আশা, 'তুই অত হাঁদা কেন রে? নতুন নোট নয় যে, জুড়ে থাকবে, বুঝতে পারব না; আমি অমনি এত ভুল করব? ও তো তোকে ইচ্ছে ক'রেই দিয়েছি।'

তার পর থেকে আর অমন বুদ্ধিমান সাজতে যায় না অবশ্য। সত্যি বলতে কি, আশাই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে সিগারেট সিনেমা কোনটাই হ'ত না। মা তো 'ওআন পাইস ফাদার মাদার'—হাড় কিপটে। তবে আশারই বা সামর্থ্য কি? স্বামী কারখানার মিস্ত্রী, তার সংসারে আর হিসেবের বাইরে বাড়তি কত থাকতে পারে? কোনদিন বা আট আনা, কোনদিন চার আনা। তবে ফাঁক পেলেই দেয় এটা ঠিক। কোন কোন দিন, সিনেমা যাবে বললে অনেক কাণ্ড অনেক কারচুপি ক'রে একটা গোটা টাকাও যোগাড় ক'রে দেয়।

তা যেমন দেয়, তেমনি একান্তে ক্ষিদেও যেন বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। এইটুকু বাড়িতে এতগুলো লোক—হারুর সত্যিই খুব ভয় করে। কিন্তু মেয়েটা যেন বেপরোয়া। এই তো ছাখো না—বেস্পতিবার, ভর সন্ধ্যেবেলা কাপড় কেচে কোথায় লক্ষ্মীপুজোয় বসবে তা নয়—এখনই ওকে ডাকা চাই!···ঘেন্না হয়ে গেছে হারুর মেয়ে জাতটার ওপরই।

সেই সঙ্গে আজ প্রবল ঘেন্না বোধ হচ্ছে নিজের ওপরই। এই প্রথম বোধ হয় নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'ল ও। এই কলচুরির ব্যাপারটা নিয়েই। নিজের অবস্থা নিজের শক্তি সামর্থ্যের দৌড় খানিকটা দেখতে পেল।

অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল, আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে। এক-একখানা গাড়ি আসছে, হুড়হুড় ক'রে লোক নামছে। প্ল্যাটফর্মের একটা খাঁজ এখান থেকে দেখা যায়। বাজারের পুঁটুলি হাতে সব ব্যস্তভাবে বাড়ি ফিরছে, কারও হাতে বা পোর্টফোলিও ব্যাগ। সকলেরই তো কাজকর্ম আছে—ওদের এই দলের কি কিছু হবে না? ধ্যাস্ শালা! বাবা মা যে গোলমাল করবে, রাজী হবে না, নইলে স্টেশনেব ধারের সব্জীওলাদের সঙ্গে সেও বসে যেত, না হয় চাল নিয়ে বসত। কিংবা য়্যালুমিনিয়মের বাসন।·

পশ্চিম আকাশের শেষ আলোটুকু যত মিলিয়ে যাচ্ছে—একটা একটা ক'রে তারা ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। তারার রাশ আকাশে। কত তারা রে! সব জায়গাতেই ভিড়, এমনি ঘিঞ্জি, ওদের এই পাড়ার মতো। আকাশে তো নাকি দেদার জায়গা, অনেকখানি ক'রে ফাঁকা, তবু এত ঘেঁষ-ঘেঁষ কেন তারাগুলো? কে জানে বাবা, এত হিসেব মাথায় ঢোকে না।···

আরে, ওটা কি? কালো মতো—?

আশা! আশা উঠে এসেছে সেলাইয়ের ইঁট বেয়ে। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

শিস দেবার মতো শব্দ ক'রে ডাকছে ওকে।

লে শালা! কারবার ছ্যাখো একবার!

হঠাৎ যেন সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল হারুর। এই এক হয়েছে নাছোড়বান্দা ছিনে-জোঁক। লজ্জা ঘেন্না কি কিছু নেই? এই লক্ষ্মীপুজোর সময়টা—। ওর ঘরেও তো ঠাকুর পাতা আছে!

ওদের দলের আড্ডায় যেমন দেখেছে নন্তুদের, মুখের তেমনিই একটা বীভৎস ভঙ্গী ক'রে উঠল হারু। অন্ততঃ ওর যেন মনে হ'ল তেমনি করতে পারল, অনেকটা খেঁকী কুকুরের মতো। তারপর চাপা অথচ রূঢ় গলায় বলে উঠল, 'না না। এখন যেতে পারব না। শুনতে পারব না কিছু। শরীর ভাল নয় আমার! কিচ্ছু ভাল লাগছে না। নেমে যাও নিচে।·· যাও, যা·—ও!'

আশা আস্তে আস্তে নেমে যায়। স্টেশনে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে, তার মাথার চড়া আলোটা অবিশ্যি সোজা দক্ষিণে—রেললাইনের ওপর পড়েছে, কিন্তু তার একটা আভা এসে পড়েছে ওদের বাড়ির ছাদের ওপরও। আশার মাথাটা নিচের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার ঠিক আগেই আলোটা এসে পড়েছিল, মনে হ'ল ওদের মেনী বেড়ালটার চোখে এই রকম আলোর আভাস লাগলে যেমন আঙরার মতো জ্বলতে থাকে, আশার চোখ দুটো-ও তেমনি জ্বলছে।

মোক্ষম রেগে গেছে, অপমানও বোধ হয়েছে।

'মরুক গে, আমার আর কী করবে! কাল ফাঁক পেলেই হাতে পয়সা গুঁজে দেবার চেষ্টা করবে আবার—হাত করবার তাল খুঁজবে!' মনে মনে বলে হারু।

ওদের বেশ চিনে নিয়েছে হারু।···

তা হোক, তবু ছাদে একা অন্ধকারে বসে থাকতে আর সাহস হ'ল না। কে জানে বাবা, ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই, ও সব পারে।

সে উঠে আস্তে আস্তে মেথর খাটবার গলির দিকের রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে নেমে এল আবার। ক্ষিদে থাক গে, ও মরেই গেছে না খেতে পেয়ে, আর তত কষ্ট হচ্ছে না। মায়ের পূজো সেরে ওঠার এখনও অনেক দেরি। এই সবে পাঁচালী ধরল। আর উঠলেই বা কি, পূজোর তো দু'কুঁচি শসা কলা আর একখানা বাতাসা। খেতে চাইলে হয়ত ওকেই ফরমাস করবে এক্ষুণি, 'যা মানিকের দোকান থেকে একখানা রুটি নিয়ে আয়, আজ আর ঘরে কিছু নেই। এখন উনুনে আঁচ দোব তবে রুটি হবে।'

অত হাঙ্গামে আর কাজ নেই। সুখের চেয়ে শুয়ে থাকা ভাল।

কিন্তু যাওয়াই বা যায় কোথায়? বাজারের দিকে গেলেই হয়ত, হাঁদু নন্তু ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে, খপাৎ ক'রে ধরবে। মাঠের দিকে তো যাওয়া যাবেই না। এক গলি দিয়ে গলি দিয়ে কারও বাড়ি যাওয়া চলে।

কেউ কি গেলে খেতে দেবে? বড় জোর এক কাপ চা ঠেকাবে। তাই, তাই সই।···

সাবধানে চলতে লাগল হারু।

সব বাড়ির দরজাই তো বন্ধ। কড়া নেড়ে দোর ঠেলে মাটি ভাপাতে যাওয়া—সে বড় খারাপ দেখায়। হয়ত এক্ষুণি জিগ্যেস ক'রে বসবে, 'কী রে, এমন হঠাৎ? কী হয়েছে? মার শরীর খারাপ হ'ল নাকি?'

এমনি হাজারো কৈফেৎ।·· সত্যি, তাদেরই বা দোষ কি! কোনদিন যায় না, হঠাৎ আজ এমন হন্তদন্ত হয়ে গেলে ভয় তো পাবেই।

তবে?

আর একটু এগিয়ে দেখল একমাত্র নিমুদাদের বাড়ির দরজাই হাট ক'রে খোলা আছে। বড় বাড়ি। অনেক লোক—কপাটও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, সাত চার—ওদেরই খুলে রাখা শোভা পায়।

শেষ পর্যন্ত—তাই বলে নিমুদাদের বাড়ি!

আচ্ছা, গোরাদের বাড়ি গেলে কেমন হয়?

গোরা ঠিক এদের দলে নেই। সে আরও গভীর জলের মাছ। কোথায় যায়, কী করে—মাঝে মাঝে বেশ টাকা খরচ করে, আবার কখনও মুখ শুকিয়ে বেড়ায়। তপু একবার বলেছিল, ও নাকি সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে। ঐ করতে গিয়ে একবার পুলিশের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিল। আর একবার একরাত হাজতে কাটাতে হয়েছে, ওর বাবা কী যেন পুলিশ ফাণ্ডে না কিসে দশটা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনে।

আবার হাজু বলে, 'না - কারা সব কি চোরা জিনিস পাচার করে, তাদের সঙ্গে ও আছে। ও ঠিক হাতে-কলমে করে না, তবে বাইরের লোকেরও তো দরকার হয় তাদের—বাইরের কাজগুলো গোরা করে। সেজন্যে ধরা পড়ার কোন ভয় নেই, তেমনি পাওনাও কম।...তবে যে কলমীর দামে টান মারবার ভয় একেবারে নেই তা নয়। সেই জন্যেই দেখিস না—মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ভাল কথা বলতে গেলেও খিঁচিয়ে ওঠে—? আমার তো মনে হয় ঐ সব হ্যাঙ্গামের দিনগুলোতেই মেজাজ চড়ে থাকে। তবে গোরা ভীষণ চালাক—ঠিক সময়ে ন্যাটা মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে যায়।'

তা হোক গে, হারুর আর কি! গোরা এককালে ওর সঙ্গে পড়ত, যে বছর ক্লাস এইট-এ ফেল করে ও সেই বছর থেকেই ছাড়াছাড়ি। তবু একেবারে যে যাওয়া আসা নেই তা নয়। এখনও পথে দেখা হ'লে সিগারেট খাওয়ায় মাঝে মাঝে। না, চাইতে হয় না, নিজেই এদিক-ওদিক চেয়ে বার ক'রে দেয়। একদিন সিনেমাও দেখিয়েছিল—কি একটা হিন্দী নাচ-

গানের বই, একেবারে পেছনের ভাল সীটে বসিয়ে। কী নরম গদিটা!

গোরা নেই এখন। তা না থাক, ওর মা তো আছেন।

'গোরা' বলে ডেকে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে খানিক ওর মায়ের সঙ্গে গল্প করলেই সময় কেটে যাবে।

॥ ৩ ॥

গোরার ঠাকুর্দা এককালে এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু লোক বলে খ্যাত ছিলেন। সে সময়, যখন এই কাটা পোশাকের (কোট-প্যান্টকে কাটা পোশাক বলত ওঁদের দেশে—উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছিলেন ওঁরা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) এত বহুল ব্যবহার ছিল না, তখনই বলাইবাবু সাহেবী পোশাক ছাড়া পরতেন না, বাড়িতে ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে থাকতেন এবং ইংরেজীতে ভিন্ন কথা বলতেন না। এমন কি ফিরিওলা ধোপা মুদী—এদের সঙ্গেও গোড়ায় ইংরেজীতে কথা বলে, তারপর যেন তারা বুঝবে না সেটা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলে—অতিকষ্টে ভাঙা বাংলায়, যেন মনে মনে তর্জমা ক'রে ক'রে বলছেন—এইভাবে বোঝাতেন। দুপুরের খাওয়াকে সর্বদা লাঞ্চ ও রাত্রের খাওয়াকে ডিনার বলতেন। ডিনারটা ঘড়ি ধরে রাত আটটায় খেতেন। সেই জন্যেই রাত এগারোটায় এক পাক বেড়িয়ে এসে শুতে যাবার আগে একটু গরম দুধ দু'খানা বিস্কুট খেতে হ'ত। সেটার নাম ছিল 'লাইট সাপার'। বলতেন, 'ইয়েস, আই হ্যাড মাই লাইট সাপার অফ মিল্‌ক্ য়্যাণ্ড বিস্কিটস—য়্যাজ ইউজুয়াল।' দুপুরে নাকি আপিসেই লাঞ্চ দিত—সাহেবদের সঙ্গে; কিন্তু মন্দ লোকে বলে, তা নয়, উনি বেরিয়ে ও-অঞ্চলের কোন আধা-ফিরিঙ্গি রেস্তোরাঁয় রাইস-কারি খেয়ে আসতেন।

সে যাই হোক, বড় বিলিতি ফার্মে চাকরি করলেও এত পয়সা করার মতো কাজ তাঁর ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা সেকশনের

ইন-চার্জ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে সেকশনেই মাত্র আট-ন'জন লোক। তা নয়, পয়সাটা ওঁর অন্য উপায়ে এসেছিল, যদিচ ক্ষেত্রটা ঐ আপিসেই।

সে গল্প বহুবার শুনেছে হারু। ওর বাবার মুখে, নিমুদার মুখে, বুড়ো তারক রক্ষিতের মুখে।

আসলে উনি ছিলেন প্রাইভেট 'বুকী'। আপিসের বহু লোকেই পাঁচ আনা দশ আনা বাজি ধরে রেস খেলত, এখনও খেলে—তাদেরই বেটিং নিতেন উনি। ক্রমে সে কথাটা সাহেবদের কানে যেতে তাঁরাও ওঁর কাছেই বেট ধরতে শুরু করলেন। কেন না ওঁদের আপিসে শনিবার কাজের চাপ বেশী ছিল, সাহেবদেরও ফি শনিবার মাঠে যাওয়া হয়ে উঠত না।

এতেই ব্যবসার ক্ষেত্র ও পরিমাণ বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সাহেবরা ধরলে পাঁচ আনা দশ আনা নয়—পাঁচ দশ টাকাই ধরতেন এক-একটা টিপে। এক-একটা সাহেব ছিল পাঁড় জুয়াড়ি —তারক রক্ষিতের ভাষায় 'রেসেল'। আর, যারা এই ধরনের জুয়াড়ি, তাদের ঝোঁক চাপে যত বেশী লাভের অর্থাৎ কমজুরী ঘোড়ার ওপর। মানে যে ঘোড়া পাঁচ টাকায় একশো সওয়াশো টাকা দেবে—তাদের ওপরই বাজি ধরবে ওরা। কে যে তাদের ঐ 'সিওর টিপ' দেয় তা ঈশ্বর জানেন। সাহেবরাও ঐ রকমই বাজি ধরত আর ক্রমাগত হারত।

বলাইবাবু সেই সুযোগে ডবল ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। মাসের শেষে যখন রেসেল সাহেবদের হাত খালি হয়ে যেত, তখন—কী আছে—'আই-ও-ইউ' না কি, একখানা চোতা কাগজে তাই লিখিয়ে আর নাম সই করিয়ে টাকা ধার দিতেন। সে টাকার চেহারাও বেচারীরা দেখতে পেত না—তাতেই বাজি ধরা হ'ত—মানে সবটাই কাগজে কলমে থাকত। মাঝখান থেকে মাইনের দিন এক-এক জনকে একশো টাকার ঐ চোতা কাগজ নিয়ে বাড়তি পঞ্চাশ ষাট সত্তর পর্যন্ত গুনে দিতে হ'ত—সুদ বাবদ। সুদটা

আগেই হিসেব ক'রে আসলের সঙ্গে লিখিয়ে নিতেন বলাইবাবু। (ঐ ধরনের দেনার সুদ পরে ধরার নিয়ম নেই নাকি।) যেন একশো সত্তরের কাগজ নিয়ে একশো টাকা দিচ্ছেন। মানে দেবার কথা, দিতেন না তো একটা পয়সাও।

অবিশ্যি কখনও কখনও যে উগরে দিতে হ'ত না কিছু, তা নয়। অনেক সময় ইচ্ছে ক'রেই দিতেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। নিজের কারবারটা বজায় রাখার জন্যেই সত্যিকারের টিপ দিতেন কিছু কিছু মক্কেলদের। সে সব ঘোড়া জিতলে বেশী দিতেও হ'ত না। দশ টাকায় হয়ত এগারো টাকা ছ-আনা। কিন্তু এক-আধবার না জিতলে নেশা জমবে না তা বলাইবাবু জানতেন। বুকীর তুর্নামও হয়ে যাবে—সবাই বলবে অপয়া।

যাই হোক, সে দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। সাহেবরা ওঁর পরামর্শ শুনতও না- তাদের দেওয়ারও কোন প্রশ্ন নেই।

টাকা রোজগারের সূত্রটা এই। চাকরি নয়। সাহেবী-আনা দেখাতেন শখের জন্যে, কাজের জন্যে কোন দরকার ছিল না। এ শখ নাকি তাঁর আশৈশব। সাহেব হবেন, সাহেবী ধরনে জীবনযাপন করবেন। মনে প্রাণে নিজেকে সাহেব বলে মনে করতেন—তা নইলে, সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ জানলে হার্টফেল ক'রে মারা যেতেন।

বলাইবাবুর সংসার ছিল বড়। নিজেরই সংসার। ভাই ভাইপো ভাগ্নে বা ঐ পর্যায়ের আত্মীয়-স্বজন কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। নিজেরই ছ'টি ছেলে চারটি মেয়ে। অন্য দিকে সাহেবদের যতই নকল করুন, ছেলে মানুষ করার দিকে তাদের মতো নজর দিতে পারেন নি। তবু, যতদিন চাকরিই প্রধান পথ ছিল রোজগারের, ততদিন কিছু কিছু পড়াশুনো

হয়েছে। বড় বি. এ. পাস করেছে, মেজ-সেজ বি. এ. পর্যন্ত পড়েছে। সেজ পরীক্ষাও দিয়েছিল, পাস করতে পারে নি। বাকী দু'জন কোনমতে ম্যাট্রিকের গণ্ডী পার হয়েছিল। ছোটটি—যাকে তাঁর সাহেব মাস্টার রেখে পড়ানোর শখ ছিল সে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্তও উঠতে পারে নি। বলাইবাবু যখন মারা যান তখন সে বোধ হয় থার্ড ক্লাসে পড়ে। তারপর কোনমতে একটা বছর ইস্কুলে টিকে ছিল—তারপরই একেবারে, 'আউট' যাকে বলে—মুক্ত পুরুষ!

তাহলেও গোরার এই ছোটকাকা এখন কী সব দালালি-ফালালি করে, একটা ইনসিওরেন্স এজেন্সিও আছে, কোনমতে চালিয়ে নেয়। চোর-জোচ্চোর নয় কোনকালেই। সম্প্রতি বিয়ে করেছে একটি মেয়েকে, সে এম. এ. পাস, আপিসে চাকরি করে—তাতেও অনেকটা সাশ্রয় হয়েছে। ভালই চলে ওদের।

সবচেয়ে পাজী হয়েছে গোরার ন'কাকাটা। এক নম্বরের ছিঁচকে চোর। মায়ের গয়না থেকে শুরু করেছিল,—গয়না কেন, ভাল কাপড় জামা শাল কিছুই বাদ দিত না। এখন ভাই-ভাজদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। কেউ কখনও কোথাও চাবি ফেলে যাবে না, কি ঘরের দরজা খুলে রেখে একটু কোথাও যাবে না -এ সম্ভব নয়। কিন্তু ওর ন'কাকা এমন অবস্থাই ক'রে তুলেছে যে, এক মুহূর্ত অসতর্ক হ'লে সর্বনাশ। লোকটির ক্ষমতা নাকি অসাধারণ, ভগবান চোর ক'রেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন। চলার সময় পায়ের আওয়াজ হয় না, চোখের পলক না পড়তে পড়তে অনেকটা জায়গা পার হ'তে পারে। ফলে অনেক সময় চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলেও লোকে টের পায় না। সরু সরু আঙুল, যে কোন খাঁজ থেকে টাকা-পয়সা চোখের নিমেষে টেনে বার ক'রে নেয়। গোরা বলে, নিজে চোর তো বটেই ছেলেটাকে পর্যন্ত যত্ন ক'রে চুরি বিদ্যা শেখায়।

আলাদা আলাদা সংসার, যতগুলো ভাই ততগুলো হাঁড়ি। সবাই পৃথক কিন্তু একই বাড়িতে বাস। দুটো ক'রে ঘর এক-একজনের ভাগে, আর যেখানে হোক একটু ক'রে রান্নার জায়গা। ফলে কোন ঘরেই কারও যেতে অসুবিধা নেই। তবে সাধারণতঃ কেউ যায় না, ছোট ছোট বাচ্চারা ছাড়া। আর যায় মেয়েরা—জায়ে জায়ে সদ্ভাব থাকার দুর্লভ দু-একটি দিনে—এ-ওর ঘরে গিয়ে বসে, ও-এর ঘরে আসে। এদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা নিজেদের নিজেদের দল ক'রে নিয়েছে, কিন্তু তাদের সে মেশামেশি বা আড্ডা ঘরে হয় না। সিঁড়ির নিচে, দালানের কোণে, রাস্তায়, বাড়ির পিছনের বাগানে, জমাদার খাটবার গলিতে। কিন্তু চোর এসব লিখিত বা অলিখিত কোন নিয়ম কি সঙ্কোচের অপেক্ষা করবে কেন? বিশেষ এই-ই যখন তার জীবিকার প্রধান উপায়?

মেজকাকা সেজকাকা দু'জনেই চাকরি করে। সাধারণ চাকরি, তবে এ বাজারেও সচ্ছলে চলবার কথা, শান্তিতে থাকার কথা। কিন্তু দু'জনেই স্বভাবের খাল কেটে জীবনে অশান্তির কুমির এনেছে। বিশেষ সেজকাকা। এক বড় সওদাগরী আপিসের ডেপুটি পারচেজিং অফিসার—বিস্তর ঘুষ পায়, অন্য উপায়েও দু' পয়সা আসে। যে মাল কেনা হয় না আদৌ, তারও চালান-বিল হয় এবং সে বিলের পেমেণ্টও হয়ে যায় নিয়মমতো। অনেক সময় আগামও হয়। এসব কথাই গোরা বলেছে হারুকে, প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়েই বলেছে, বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ ক'রে।

কিন্তু বাড়তি টাকার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কতকগুলোর অভ্যাসও এসেছে। পানদোষ এবং স্ত্রীলোকদোষ—দুই-ই। এসব পথ সুগম করতে নাকি ওপরও'লাদের বার-এ রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ মদ খাওয়াতে হয়। মেয়ে যোগানোরও দরকার হয় মাঝে মাঝে। তাদের খাওয়াতে গেলে সঙ্গও দিতে হয়। ফলে টাকা আসার পথটা পিছল করতে গিয়ে যাওয়ার পথটাও পিছল

হয়ে গেছে। আগে বাইরে থেকে মদ খেয়ে আসত, বাড়িতে এসে এক-আধবার বমি করা ছাড়া অন্য লক্ষণ কেউ টের পেত না। ইদানীং বাড়িতেও আনতে শুরু করেছে বোতল, চেঁচামেচি দরজা-ভাঙ্গা-ভাঙ্গিও করে। মেয়ে যোগাড়-যোগানোর ব্যাপারেও তাই। তাই আবার পুলিশ টানাটানিতে পড়তে হয় মাঝে মধ্যে—অনেক টাকা পুলিশ ফাণ্ডে দিয়ে তবে রেহাই মেলে।

মেজকাকা কি একটা বড় আধা বিলিতী কারখানায় কাজ করে, মাইনে ভাল, সুবিধাও অনেক রকমের। এমন কি বছরে স্বামী-স্ত্রীর বাইরে বেড়াতে যাবার দু'খানা রেলের টিকিটও পাওয়া যায়। অসুখ-বিসুখের যাবতীয় খরচা তো বটেই। কিন্তু তাকেও এক নেশায় ধরেছে, সেই নেশাতেই সর্বস্বান্ত হতে বসেছে সে। না, মদ বা মেয়েমানুষ বা রেসের নেশা নয়। তার নেশা—বড়লোক হবার, স্বাধীন ব্যবসা করার! সে চায়, বিড়লা ডালমিয়া যুগীলাল কমলাপৎ কিংবা টাটা হ'তে। তাকে সবাই শিল্পপতি বলবে এই তার স্বপ্ন। এর জন্যেই অশান্তির শেষ নেই।

অন্য কোন কারবার শেখে নি, কিছুই জানে না বলে বাড়ির পিছনের বাগানে একটা টিনের চালা তুলে ছোটখাটো পকেট কারখানা মতো করেছে। তার জন্যে গোড়া থেকেই গণ্ডগোল। বাড়িটা আপসে ভাগ হয়েছে, বাইরের বাগান নিয়ে কোন ফয়সালা হয় নি এতাবৎ, তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি মনোমালিন্য চলছে এখনও। সেটা ভাগ করতে বোধ হয় আদালতে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। তার মধ্যে যেটুকু সমতল ভাল জমি সেটুকু রঞ্জুকাকা দখল ক'রে বসে থাকায় বাকী সব ক'জন ভাইয়েরই আপত্তি। গোরার বাবা ট্রেসপাসের নালিশ করবেন বলে উকিলের চিঠি দিয়েছেন, সেজকাকা পার্টিশন ক'রে দেবার জন্যে আদালতে কমিশনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। এধারে কর্পোরেশন সব ক'জন ভাইকেই নোটিশ দিয়েছে, বে-আইনী চালা তোলা এবং হেলথ পারমিট না নিয়ে কারখানা খোলার জন্যে।

এতেই অশান্তির শেষ নয়। লুকিয়ে চুরিয়ে কারখানার লোক মারফত দু-চারটে যন্ত্র সরিয়েছিল রঞ্জুকাকা, তাদের যা দেবার তা সবই দিয়েছে ঠিক ঠিক, কথামতো, কিন্তু ওদের মধ্যে এক দারোয়ান চুকলি খেয়েছিল। তারও দোষ নেই, দেশ থেকে ভাতিজা এসে বসে আছে দশ মাস, একটা চাকরি না হ'লেই নয়। কোন রকমেই সে ব্যবস্থা না করতে পেরে এই পথ নিতে হয়েছে তাকে। ওআর্কস্ ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে অনেক কাণ্ড ক'রে বিরাট চুরিটা ধরেছে, তার জন্যে অন্য কোন বকশিশে তার লোভ নেই, শুধু ভাতিজার একটা চাকরি হ'লেই সে খুশী।

সেও থানা-পুলিশ টানাটানি। তার চেয়েও বড় কথা—চাকরি চলে যেত। অতিকষ্টে ওআর্কস্ ম্যানেজারকে 'খুশী' ক'রে, কম মাইনেতে নতুন চাকরি হিসেবে ঢুকে কাজ করবে—গ্র্যাচুইটি বোনাস এই নতুন হিসেবেই নেবে, ওজর-আপত্তি করবে না এই চুক্তিনামায় সই ক'রে তবে ভাতের ব্যবস্থাটা বাঁচিয়েছে।

ওদিকে আয় কমেছে। এদিকে লোকসান দিতে হচ্ছে।

কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা এক জিনিস—ব্যবসা চালানো অন্য। কাজে নেমে দেখল সহস্র বাধা। এগুলো আগে ভাবে নি। বিশেষ, কর্মচারী হয়ে মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন করাটা খুবই সহজ, রুচিকর তো বটেই—এখন নিজে কর্মচারী রাখতে গিয়ে এর অপর দিকটা বুঝল, যাকে বলে মজা টের পেল।

ফলে বোন ভগ্নিপতি বন্ধুবান্ধব শ্বশুরশাশুড়ী শালা ভায়রাভাই—সকলের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাওয়া যাকে বলে, তাই গেছে।

গোরার বাবা শ্যামসুন্দরবাবু বলাইবাবুর আপিসেই ঢুকেছিলেন। মাঝারি আয় মাঝারি জীবনযাত্রা। মনোভাব ও

দৃষ্টিভঙ্গীও মাঝারি, সাধারণ। তিনটে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে তাঁকে, আরও একটা বাকী। সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাণপণে। রিটায়ার করার খুব বেশী দেরি নেই। তার আগে মেয়ে পার করতে চান। তাতে অনেক সুবিধা, চাকরি চলে গেলে সে সব সুবিধা বা সাহায্য কিছুই পাবেন না, আয়ও কমে যাবে।

বস্তুতঃ মেয়ের বিয়ের তদ্বির, চাকরি ও সংসার বজায় রাখা—এতেই আর ছেলেদের দিকে তাকানো হয়ে ওঠে নি। এখনও যে সে সময় খুব আছে তা নয়। অবশ্য এখন আর কীই বা আছে তাকাবার! নজর দেবার বয়স আর কারও নেই বড় একটা। ছোট ছেলেটা ইস্কুলে পড়ে কিন্তু সে আক্ষরিক অর্থেই নামমাত্র। অর্থাৎ নামটাই আছে শুধু খাতায়। সে যে ইস্কুলে পড়তে যায় না তা সবাই জানে, মাস্টারমশাইরাও। শুধু দল পাকানো খেলাধুলো এবং মস্তানী করা যাকে বলে, এই করতেই যায়। ক্লাসে যে ওঠে সে—স্রেফ মাস্টারমশাইদের ভয় দেখিয়ে। তার বিশ্বাস সে বোর্ডের পরীক্ষাও এইভাবেই পাস ক'রে যাবে।

দিনকতক সাধারণ যে সব পরিচিত পদ্ধতি, তাতেই শাসন করার চেষ্টা করেছিলেন শ্যামসুন্দরবাবু, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ইস্কুলের মাইনেটা দেন বিবেকের কাছে খোলসা থাকতে। নইলে মাইনে জমা না পড়লেও নাম কাটা যেত না। তবে একটা সুবিধে, অদু—(অদ্বৈত নাম রেখেছিলেন গোরার ঠাকুমা, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেই ভাবেই ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের নাম রেখেছিলেন, স্বামীর আধুনিক নামের তালিকা উড়িয়ে দিয়ে) বাড়িতে বড় একটা থাকে না, চুরি-টুরিও করে না। সিগারেটের পয়সা সে সেজদা বা গোরার কাছ থেকে সোজাসুজি চেয়েই নেয়। অন্য ঝঞ্ঝাটও নেই। খাবার তার ঢাকা থাকে—যখন সময় পায় এসে খায়। কোন কোনদিন সে সময় হয়ে ওঠে না। শুধু শুধু নষ্ট হয়—এ অনুযোগের উত্তরে মাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটা কোন লোকসান নয়। খেলেও খরচ হ'ত, আর খরচ যখন

হয়েই গেছে তখন খাওয়াও যা না খাওয়াও তা। খেলে তো আর এটা ফিরত না।

গোরাদের কোন ভাই-ই বেশী লেখাপড়া শেখে নি, স্কুল ফাইন্যালও একজন ছাড়া পারে নি পাস করতে, কিন্তু তারা প্রায় সবাই আত্মনির্ভর। সংসারে কিছু দেয় না বটে—তেমনি নিজেদের হাত-খরচার জন্যে সংসারের কাছে হাতও পাতে না। নিজেদেরটা নিজেরাই চালিয়ে নেয়। কোন্ পথে নেয় তা কেউ জানে না, বাবা মা প্রশ্ন করতে গেলে কতকগুলো উড়ো-উড়ো কথা শোনেন। ইদানীং আর কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। শ্যামসুন্দরবাবু রিটায়ার্ড্ হবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন, দিনের হিসাব করেন সর্বদা। অর্থাৎ আর ক'দিন বাকী রইল চাকরির। এর মধ্যে মেয়ের বিয়ে সেরে যাতে রিটায়ার করার আগেই সে দেনা শোধ ক'রে দিতে পারেন—সেই এখন একমাত্র চিন্তা তাঁর। বলেন, 'ছেলেদের বড় ক'রে দিয়েছি, খুঁটে খেতে শিখেছে। পারে রোজগার ক'রে বিয়ে-থা করবে, সংসার পাতবে। নয় তো অমনি দাগা ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াবে। আমি তো চেষ্টার কসুর করি নি, ওরা কিছুতেই লেখাপড়ার ধার দিয়ে গেল না, তার আমি কি করব!'

গোরার মা অবশ্য ফোঁস ক'রে ওঠেন, 'কী চেষ্টাটা তুমি করলে শুনি! কোনদিন ওদের নিয়ে বসেছ একটু? কী করছে না করছে খবর নিয়েছ? ওকে বলে বেগারঠেলা পড়ানো। ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েই দায়ে খালাস, নিশ্চিন্তি। ওতে কি ছেলে মানুষ হয়, না লেখাপড়া হয়?'

'কেন, মেয়েদের হয় নি? যা হোক একটা ক'রে পাস তো করেছে সবাই, এই ছোট্টটাও দেখো ঠিক পাস ক'রে বেরিয়ে যাবে। ওদের নিয়ে কি বসেছিলুম না মাস্টার রেখেছিলুম? ছেলেদের জন্যে তো তবু একজামিনের আগে মাস্টার রেখেছি, কোচিং-এ দিয়েছি। ওদের কিচ্ছু হবে না। হবে কেন? জানে

তো ঘরে ভাত বাড়াই আছে, যখন হোক এসে খেয়ে মাকে কেদাক্ত করলেই চলবে। নিশ্চিন্তি! যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে তোমার আদরেই গেছে।'

তারপর ক্ষোভ ক'রে বলেন, 'বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আপিস করব, টিউশ্যনী করব, মেয়েদের বিয়ের জন্যে ঘুরব টো-টো ক'রে—না ওদের নিয়ে বসব? আমার সময়টা কখন? আমি কি এক দণ্ড বসে আছি! এসব করছি কার জন্যে? ওদের নিয়ে বসতে গেলে এধারে পেট চলত না যে! তোমার ছেলেদের তো পেটও ভরানো চাই, সে চিন্তা যে আগে।'

এবার ক্ষীণ হয়ে আসে মায়ের কণ্ঠ, 'তা একটা কিছু হিল্লে টিল্লেও তো ক'রে দিতে হয়। যাদের জন্ম দিয়েছ, তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার দায়িত্বও তো তোমার।'

'কাকে, বলি কাকে দাঁড় করাবো তাই শুনি!' এবার রীতিমতো চেঁচিয়ে ওঠেন শ্যামসুন্দরবাবু, 'তোমার গুণধর বড় ছেলের জন্যে কী না করেছি! আমার বাবা যে কত লোককে এক কথায় চাকরি ক'রে দিয়েছেন, কৈ—আমার ভাইদের বেলায় পারলেন? তবু সে ছিল ইংরেজ আমল, কোনমতে একবার কথাটা আদায় করতে পারলেই হ'ত, হাকিম নড়লেও হুকুম নড়ত না। একটা পাসও যে করে নি, তাকে এই বাজারে আমি ঢোকাবো কি ক'রে? কী না করেছি আমি! তেলেঙ্গী ছোট সাহেবটার পায়ে ধরতে বাকী রেখেছি শুধু। তা কী হ'ল, না ছোট সায়েব বললে, এখন ক্লাস ফোর ক'রে নাও, পরে চুপিচুপি প্রমোশন দিয়ে তুলে নোব। তোমার নবাবপুত্তুর বড় বেটা বললেন, "ও কাজ আমি করব না। বেয়ারারা কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করতে আসবে, বাবুরা তুই-তোকারি করবে, এঁটো কাপ সরাতে বলবে—সে আমার দ্বারা হবে না। আর ও মাইনেতেই বা আমার কি হবে—এক হপ্তার হাতখরচই আমার ওর চাইতে বেশী।"...লম্বা লম্বা বাত শুধু। পেছনে নেই ইন্দি, ভজরে

গোবিন্দি। তোর নেই এক বর্ণ লেখাপড়া পেটে—কে তোকে ডেকে ছোটলাটের চাকরি দেবে তাই শুনি!···আর ওর কথাই বা বলব কি, সবাই তোমার সমান। নিক্তির তৌলে মাপা।

'মেজবাবুকে বললুম ভাগবত স্নুরেকার বড় কারখানা, মেকানিক য়্যাপ্রেন্টিস ক'রে ঢুকিয়ে দিচ্ছি—আখের গুছিয়ে নিতে পারবি। কত বি. এস-সি., এম. এস-সি. মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে ঢোকার জন্যে, নেহাত আমার সঙ্গে খাতির ছিল, তখন একটা খুব দায়ে ঠেকেছিল—তাই বলেছিল এক বছর থাক, পরে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান ক'রে নেবে—তা গুণবান ছেলে তোমার, সিরাজদ্দৌলার নাতি, উত্তর দিলেন, "নোয়া পেটা কাজ আমার দ্বারা হবে না···" তাহলে হিল্লেটা কার করি বলো!···এক হিল্লে নিজের হ'তে পারে যদি একগাছা দড়ি নিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে পারি। সকল আপদের শাস্তি!'

অতঃপর গোরার মায়ের ধারা নামে চোখে। মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকেন।

মেজ ছেলে কী করে, কী ক'রে বেড়ায়, কে এত হাত-খরচা যোগায় তার কিছুই জানেন না তিনি, তাই ওর জন্যেই বেশী ভয় তাঁর। সিগারেট লাগে দিনে তিন-চার প্যাকেট, ইদানীং এক-একদিন মদের গন্ধও পাচ্ছেন মুখে। কিছুদিন ধরে আবার নাকি কে একটা মেয়েও জুটেছে। তাকে নিয়ে সিনেমা চিড়িয়াখানায় যায়, ট্যাক্সী ক'রে ঘোরে। মেয়েটা বোধ হয় ওর চেয়ে বয়সে বড়, ডাইভোর্স করা। এত খরচা যোগায় কে! এক-এক সময় ভয় হয়, মুখে বলেও ফেলেন, 'হ্যাঁগো, নোট-টোট জাল করছে না তো নিতাই?'

শ্যামসুন্দর উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'ওসব আমাদের ছোটবেলায় ছিল। তখন নোট জাল ছাড়া কোন লোকের মোটা টাকা আয় কেউ ভাবতেই পারত না। এখন রোজগারের হাজার দোর খোলা। সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে ভদ্রভাবে গুণ্ডামি ক'রে

বেড়ানো। না না। ওসব ছাড়ো, ওদের চিন্তায় আর দরকার নেই, মাথা ফাটিয়ে অপঘাতে মরবে কিংবা জেলে যাবে—এ তো পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক, রিটায়ার ক'রে টাকাকড়ি নিয়ে—আজকাল আবার থোক টাকা ছাড়া কিছু পেনসনও হয়েছে—কাশী কি বৃন্দাবনে চলে যাই, ভগবানের নাম করব থাকব—ওরা যা পারে, যেভাবে পারে—চালাবে। চালাক না চালাক, আমার দেখার দরকার নেই।'

এসব হারু নিজের কানে শুনেছে। বাড়ির অন্য লোকও এসব আলোচনা করে। শুনতে কোন অসুবিধেও নেই সে সব। গোরারই তবু একটু সুখ্যাতি করে অনেকে। সে-ই তবু সংসারে কিছু দেয়—হাতে টাকা এলে। এখনও তাকে মদ খেতেও কেউ দেখে নি। মেয়েদের নিয়ে ঘোরাফেরা—সেও খুব বাড়াবাড়ি গোছের কিছু নয়। সাধারণ, যেমন ঐ বয়সের সব ছেলেরাই করে, ফষ্টিনষ্টি, আড়ালে আবডালে একটু ঘনিষ্ঠতা, দু-একদিন সিনেমায় নিয়ে যাওয়া—এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

কী-ই বা বয়স ওদের! গোরাই তো ওর বয়সী প্রায়। তার ওপরে একটা বোন, বোনের ওপরেই মেজদা। এই বয়সেই যা কাণ্ডটা করে। ভদ্রভাবে গুণ্ডামি। ছোঃ! শুধুই গুণ্ডামি! হারু নিজের চোখে দেখেছে, কেওড়াতলার মোড়ে চলন্ত ট্যাক্সী থেকে একটা মেয়েছেলের হার ছিঁড়ে নিতে। এখন আবার ঐ কেল্‌টি মাগীটা এসে জুটেছে—মন্দা দত্ত।

মাগীই বলবে, মাগী নয় তো কি! নিতাইদার বয়স যদি খুব বেশী হয় তো পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। মন্দার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয় কোনমতেই। তা হোক, নিতাইদার মধ্যে এমন কি রস পেয়েছে কে জানে। হারু শুনেছে ও-ই মুঠো-মুঠো টাকা যোগায় নিতাইদাকে। নিতাইদাও সেই জন্যে খুব মন যুগিয়ে থাকে,

পোষমানা বাঁদরের মতো। দু'জনে যখন রাস্তায় চলে—নিতাইদা সর্বদা ঝুঁকে থাকে ওর দিকে—যেন ইষ্টিমন্তর্ শুনছে।

মাগীটার কথা সব শুনেছে হারু নন্তর মুখে। ওদের নাকি খুব জানাজানি। স্বামীটা ছিল পয়সাও'লা, অঢেল পয়সা। কপাল খারাপ তাই, নইলে সুন্দর সুন্দর মেয়ে দু' পায়ে জড় হবার কথা। এ মেয়ে লেখাপড়া জানে, কী সব নাকি ব্যবসাট্যবসা করত আইবুড়ো বেলায়--আসলে বাপের ফেল করা কারবার আগলে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থাকত—সেই দেখেই গলে যায়, ভাবে ওর ব্যবসাতেও খুব সাহায্য করবে। নইলে চেহারা তো ঐ বৃষকাঠ একেবারে, তার ওপর কালো। থাকার মধ্যে দুটো বড় বড় চোখ, তাও --তাতেও—বাহার নেই কিছু, গোরুর মতো গোল ড্যাবা-ড্যাবা, তেমনি কোলে দু' ইঞ্চি কালি, গালের ওপর পর্যন্ত সে কালি গড়িয়ে এসেছে। দেখলে ভয় করে, মনে হয় সত্যিই কে তুলি ক'রে কালি লেপে দিয়েছে। থিয়েটারের সাজা ডাইনী বলে মনে হয়। বেঁটেও তেমনি। নিতাইদার কোমরের কাছে পড়ে থাকে।

সে হতভাগা বরটার বিয়ে করার পরই নেশা ছুটে গেল। বিশেষ যখন দেখল শ্বশুরের কারবার বলতে বিরাট তামাশা একটা, শুধু ঠাটটা আছে কোনমতে। কোন কেনা-বেচা সাপ্লাই কিছুই নেই, দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। এর কাজ ছিল —খুব কইয়ে-বলিয়ে, মুখে খই ফোটে—সাজানো আসবাবের মতো আপিসে বসে শুধু পাওনাদার তাড়ানো—কাজ বলতে এই বোঝে। লাভের মধ্যে সেই শ্বশুরবাড়িও খানিক ঘাড়ে চেপেছে, তাদের মাসোহারা পাঠায় তাদের মেয়ে।

এই নিয়েই খিটিমটি —এদিকে বরটার আপিসে এক টাইপিস্ট মেয়ে জুটল, দেখতে নাকি 'সোপ্যো' (নন্তর ভাষায়)- অর্থাৎ লোভনীয়, চেহারা দেখেই চাকরি দিয়েছিল কেলটির বর, ভেবেছিল ঘরে সুখ না পাক, এখানে অন্ততঃ কিছুটা মজা লুটতে পারবে,

পুষিয়ে যাবে। কিন্তু সেও নাকি খেলোয়াড় মেয়ে, সে বললে, 'তা হবে না। বিয়ে না করলে গায়ে হাত দিতে পারবে না।'

এ সব কথা তো চাপা থাকে না—আপিসসুদ্ধ কানাঘুষো যেকালে—কথাটা কেল্‌টির কানেও উঠল। ও কিন্তু ঝগড়াঝাটিও করলে না, কান্নাকাটিও না—বললে, 'বেশ, আমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দাও, আর এক লাখ টাকা—আমি সেপারেশনে রাজী আছি।' সে ভদ্রলোক তখনই রাজী হয়ে গেল। বেঁচে গেল সে। তার তখন ওদিকে নতুন নেশা—এদিকে অরুচি। টাকারও তো অভাব নেই। ফ্ল্যাট নয়, একটা বাড়িই কিনে দিয়েছে ওকে, একতলায় ভাড়াটেসুদ্ধ। আর ঐ এক লাখ টাকা। এর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে সেই টাইপিস্ট ছুঁড়িটাকে বিয়ে করেছে।

তবে, নন্তু বলে, এখানেও কাঠে কাঠে পড়েছে। মানে নিতাইদাতে আর কেল্‌টিতে। মেয়েটা চায় ডব্‌কা ছেলেটাকে ভুলিয়ে বিয়ে করিয়ে তার ঘাড়ে চাপতে, নিতাইদা চায় চারে রেখে খেলিয়ে সুবিধেমতো মোটামুটি খানিকটা টাকা খ্যাঁচ মেরে খাব্‌লে নিয়ে সরে পড়তে। সেই খেলাই চলছে। নিতাইদা এমন ভাব দেখায় যেন ওর মতো সুন্দরী মেয়ে আর একটিও দেখে নি। এমন মেয়ের গোলামের গোলাম থাকতে পেলেই সে খুশী।

এ সবই অবশ্য নন্তুর কথা। তবে নন্তু এসব ব্যাপারে ঘুণ। ওর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে।

গোরাদের বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ চমক ভাঙল হারুর। সারাদিন হটিয়ে হটিয়ে বেড়িয়েছে, তার ওপর পেটে এখনও কিছু পড়ে নি, কেমন যেন ভেতরে ভেতরে একটা ঝিমমতো এসেছিল। হাঁটছিল ঠিকই—কিন্তু সে ঘুমের ঘোরে চলার মতো, স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন হাঁটে মানুষ। এদের কথা ভাবতে ভাবতে মনের

কোন্ গভীরে চলে গিছল, আধো ঘুম আধো জাগার মধ্যে, তলিয়ে গিয়েছিল যেন। পা দুটো উঠছিল পড়ছিল নিতান্ত অভ্যাসের বশেই। সেই স্বপ্নের ভাবটাই একটা ধাক্কা খাবার মতো হয়ে ভেঙে গেল। আর আচমকা ঘুম ভাঙা বলেই বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল ভয়ে—পা দুটো যেন ভেঙে এল।

পুলিশের গাড়ি।

হারুদের পাড়া থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যে বড় বিশ ফুট রাস্তাটা চলে গেছে, সেটার দু'পাশে আগে ঘন জঙ্গল ছিল—আসস্যাওড়া, কালকাসন্দা, ঘেঁটুফুল আর বিশল্যকরণীর– এদের ওপর বড় বড় তেঁতুলগাছ আর বাঁশঝাড়ে অন্ধকার হয়ে থাকত জায়গাটা। একথা গোরার বাবার মুখে অনেকবার শুনেছে। বলাইবাবু এখানে প্রায় দু'বিঘে জমি কিনেছিলেন তখন—সস্তার মুখে, সওয়াশো টাকা কাঠা হিসেবে। এখন আর সে জঙ্গলের কিছুই নেই.—সে জায়গায় ছোট ছোট বাঁকাচোরা বিশ্রী চেহারার বাড়ি (বাড়িও'লার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী), যেখানে সেখানে খাটা পাইখানা আর খোলা নালা—পথের দু'ধারে এই দৃশ্য শুধু।

কেবল বলাইবাবু তাঁর বাড়ির চারদিকে একটু বাগান রাখতে পেরেছিলেন, অনেকখানি জমি ছিল বলে। আম কাঁঠালের গাছও লাগিয়েছিলেন দু-চারটে। সেই সঙ্গে পুরনো তেঁতুল গাছ বাঁশঝাড়ও একটা একটা রয়ে গেছে। আগে পাঁচিল ছিল, এখন সে পাঁচিল ভেঙে গিয়ে প্রায় সদর রাস্তার চেহারা নিয়েছে। আর সেই জন্যেই কলা-আনারস-বাতাবি লেবু এসব ফলের গাছ কি ফুলের গাছ কিছু থাকতে পায় না। ভাগের বাড়ি, পাঁচিল দবার সামর্থ্যও নেই কারও, ইচ্ছেও নেই।

গোরাদের সেই সামান্য একটু ছায়'র,মধ্যেই পথ থেকে উঠে ওদের জমিতেই অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। চট্ ক'রে নজরে পড়ে না, ওদের বাড়িতে যাবার জন্যে এদিকে এসে পড়েছে বলেই চোখে পড়েছে হারুর।

কিন্তু অন্ধকার যতই থাক, এ গাড়ি ভুল হবার কারণ নেই। এ চেহারা ওর চেনা। ওর কেন, সকলকারই। এ গাড়ি মাঝে ছুটো তিনটে বছর প্রায় নিত্যই এসেছে পাড়ায়। দিনে ছু-তিনবারও এসেছে। আজকাল আর পুলিশের নাকি সে প্রতাপ নেই, কম পুলিশ খুনও তো হয় নি এ পাড়ায়—ভয়ে দিনকতক এখানের কোন কোন পুলিশের লোক লালবাজারে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল—তবু ভয় হয়, এটাও ঠিক। ধরে নিয়ে গিয়ে যা মারপিট করেছে! কেউ কেউ আর ছাড়াই পায় নি, একটা না একটা ছুতোয় আটকে রেখেছে। অনেক সময় দোষীর দেখা পায় নি, নির্দোষকে ধরেছে। সেই আরও ভয়।

প্রথমটা যা মনে হ'ল, এ অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—ছুটে পালায় এখান থেকে। তার পরই মনে পড়ল ভীমের ছুর্গতিটা। ভীম ওদের ওপরের ব্যাচে, দাদা বলে ওরা। সে এ সবে নেই, তার একমাত্র নেশা মেয়ে। সে যদি ঐ আশা বৌদির মতো কাউকে পেত, জীবনে বোধ হয় বাড়ি ছেড়ে বেরোত না। কদাকার চেহারা —কালো রোগা শ্রীহীন—কিন্তু মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। নিত্য নতুন জুটিয়ে নেয় ঠিক। এ পর্যন্ত যে কত মেয়েকে ধরেছে আর ছেড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই ভীম একবার এমনি একটা অবস্থায় পড়ে যায়। গলির মধ্যে গাড়ি রেখে নন্তুদের বাড়ি ঢুকেছিল পুলিশ— হঠাৎ গলিতে ঢুকে পড়ে সামনে পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করে। আর যায় কোথায়! ছুটে এসে খপাৎ ক'রে টুঁটি টিপে ধরলে এক বেটা জোয়ান সিপাই। তারপর যেমন বেড়াল বাচ্চা টুঁটি টিপে নিয়ে যায়, প্রায় তেমনি ক'রেই নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললে।

কত কেঁদেছিল ভীম, সিপাই দারোগা সবাইকার পায়ে ধরেছিল, কিন্তু তারা ছাড়ে নি, ছু'দিন হাজতে পুরে রেখেছিল, এদিকেও নাকি বেদম 'ধোলাই' দিয়েছে– ছাড়া পেয়ে ফিরে এল একেবারে মড়ার দশা হ য়, চেনা যায় না এমন চেহারা। ছু'দিনেই আধখানা হয়ে গেছে, যত না অত্যাচারে তত ভয়ে।

সেইটে মনে ছিল বলেই—অথবা ঠিক সময়ে মনে পড়ে গেল বলে—হারু আর পালাবার কি ফিরে যাবার চেষ্টা করল না। বুকের মধ্যেটায় হিম-হিম লাগলেও, পা-দুটো পাথর বোধ হ'লেও, কোনমতে পা-পা ক'রে এগিয়েই গেল। শালা! গলাটা এমন শুকিয়ে গেল হঠাৎ। হয়ত ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোবে না।···

গোরাদের অংশে যাবার রাস্তা বাড়ির পিছনে—পুকুরের দিক দিয়ে। বাড়িটা প্রায় প্রদক্ষিণ ক'রে গিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে উঠোনে পড়ে তবে ওদিকে যাওয়া যায়। চেনা পথ কিন্তু আজ আর অত দূর গেল না। মাঝামাঝি, সেজ কাকীমাদের রান্নাঘরের কাছাকাছি এসে সেইখান থেকেই ডাকল গোরাকে।

আগে মনে হয়েছিল ডাকা যাবে না, কিন্তু বেশ জোরেই ডাকতে পারল তো! 'গোরা' বলে একটা হাঁক দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার ডাকল, আরও চড়া সুরে—'গোরা!'

সামনের দিকের একটা ঘরের দরজা তুলে সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে এলেন সেজ কাকীমা। বাইরের বারান্দায় অল্প ক'টা সিঁড়ি ভেঙে তর তর ক'রে নেমে কাছে এসে বললেন, 'আ গেল! তুই আবার এর মধ্যে আসতে গেলি কেন? গোরাকে ডাকতে আসার আর সময় পেলি না! গোরা কি এ সময় থাকে! বাড়িময় পুলিশ রৈরৈক্কার চলছে—! ছোঁড়া দেখলেই হয়ত ধরবে!'

'কিন্তু ব্যাপার কি সেজ কাকীমা?' ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করে হারু।

'ব্যাপার আর কি, মেজবাবু! নিতাইবাবু আমাদের!' দ্রুত তেমনি চাপা গলায় বলে যান সেজ কাকীমা, 'নিউ আলিপুরে নাকি ক'দিন আগে কি ডাকাতি হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা মুখোশ পরা ক'টা ছেলে এসে পিস্তল দেখিয়ে সব গয়না লুটে নিয়েছে। শখও বলিহারি যাই বাবা, এই দিন কাল, একা মেয়েছেলে থাকে ঘরে—নিজের গয়না তুলে এনেছে লকার থেকে আবার কোন বড়লোক-

বোনের গয়না চেয়ে এনেছে। চাকর কি ঝি কেউ সন্ধান দিয়েছে আর কি! এরাও তক্কে তক্কে ছিল, বারো চোদ্দ হাজার টাকার জিনিসে ঘা দিয়েছে। পুলিশে কুকুর এনেছিল, ধরতে পারে নি। শেষে কোথায় যেন ড্রেনচাপা লোহা তুলে ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল, তোলবার সময় নালা-সাফকরা মিতুয়া দেখতে পায়—সে-ই পাড়ার ছেলেদের খবর দেয়। দু'জন ধরা পড়েছে, দলে ছিল নাকি ছ'জন মোট। ঐ দু'জনকে বেদম প্যাঁদানি দিতেই তারা বাকি কজনের নাম বলে ফেলেছে। তার মধ্যে নাকি নিতাইয়ের নামও ক'রেছে। কাজেই পুলিশ এসেছে, খানাতল্লাশী চলছে—আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। আর কোন চোরাই মাল। আবার ত্যাখ না, আজই নাকি বাবু—ঐ যে মন্দা ঘোষ বলে মাগীটার সঙ্গে ঘুরছিল—তাকে বে করেছে রেজেস্টারী ক'রে। সেইখান থেকে তার বাসা থেকেই গ্রেফ্‌তার করেছে নিতাইকে।...তা হোক, তুই যা, তোর সঙ্গে ফিসফিস ক'রে কথা কইছি, তোকেও সন্দ করবে, আমাকেও।'

তারপর, হঠাৎ অকারণেই গলা চড়িয়ে বললে, 'তুই সেদিন মুড়ি এনে দিয়েছিলি সে পয়সাটা আজও দিতে পারলুম না বাবা। বাড়িতে বড্ড হাঙ্গামা। কাল এক সময় আসিস, দিয়ে দোব। কিছু মনে করিস নি। পান? না রে, পান আজ আর সাজা হয় নি। তোর মাকে বলিস।'

এই বলে ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকে গেলেন আবার।

তিনি ওকে বাঁচাবার জন্যেই এই শেষের কথাগুলো বললেন, সেটা বুঝলেও—এতে কী ক'রে বাঁচবে ও, যদি পুলিশ সন্দেহ করে, তা ঠিক বুঝতে পারল না। আসলে বোধ হয় সেজ কাকীমাও সেটা বোঝেন নি, কোনমতে যা মুখে এসেছে তাই বলে, প্রতিদিনের আসা-যাওয়া ও লেনদেনের একটা সহজ সম্পর্ক আছে এইটে বোঝাতে চেয়েছেন।

হারুও বুকের কাঁপুনি যথাসম্ভব দমন ক'রে সহজ হবার ভান করে—শিস দেবার ভঙ্গি করতে করতে পায়ে পায়ে বেরিয়ে যায় সেখান থেকে।

কেবলই মনে হচ্ছে এই বুঝি পেছন থেকে এসে কেউ বেড়াল-ছানার মতো টুঁটি টিপে ধরে। অথচ দেখতেও সাহস হচ্ছে না, যদি পেছন ফিরে ভয়ে ভয়ে তাকানো দেখেই ওরা আরও সন্দেহ করে!

॥ ৪ ॥

নিমুদাদের বাড়ি ঢোকার ইচ্ছে আদৌ ছিল না হারুর।

কিন্তু তখন ওর এমন অবস্থা, পা আর কোনমতেই চলছে না। গলা কাঠ—মনে হচ্ছে বুকের মধ্যেটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে—কোথাও একটু না বসলেই চলছে না। আর গোরাদের বাড়ি থেকে ওদের পাড়ায় পড়তে প্রথমেই নিমুদাদের বাড়ি পড়ে। ওর বিশেষ চেনাশোনা বাড়ি হিসেবে অবশ্য। নতুন কারা বাড়ি ক'রে কিংবা ভাড়াটে হয়ে এসেছে—তাদের বাড়ি তো আর ঢোকা যায় না।

তবুও হয়ত অত সহজে ঢুকত না, যদি না নিমুদাদের সদর দরজাটা হাট ক'রে খোলা থাকত। কোনদিনই এমন খোলা থাকে না, নিমুদার মার খুব চোরের ভয়, সন্ধ্যে থেকেই বসে পাহারা দেন তিনি। আর হাঁক পাড়েন, 'অরে অ ফেলি, দরজাটা দিয়েছিস? ...ঐ যে বাচ্চু বেরিয়ে গেল, তার পর? ক্যা? ক্যা ডাকে? বলি ওরে অ নাস্তি, কে ডাকছে ছাখ না, পাশের জানলা দিয়ে দেখে তবে খুলিস!' আজ অন্য রকম তার মনে—আজ বেস্পতিবার, লক্ষ্মীপুজোয় বসেছেন বলেই মুখ বন্ধ আছে। কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, অত আর কে খবর রাখে!

দোর খোলা পেয়েই ভারী-হয়ে-ওঠা-পা ছুটো একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। সেই জন্যেই আরও ওখানে যেতে হ'ল। মনকে বোঝাল, 'আমার আর কি, আমার সঙ্গে তো আর ওদের কিছু হয় নি। একটু বসে ছুটো কথা কয়ে চলে এলেই হবে।'

বাড়িতে ঢুকতেই—ঢুকতে কেন, ঢোকার আগে পথ থেকেই দেখল নিমুদার বৌ পারুল বৌদি এদিকেই আসছেন। বোধ হয় ঘর থেকে কোন কাজে বেরোতে গিয়ে দরজা খোলা নজরে পড়েছে সেটা দিতেই আসছিলেন—ঠিক সেই সময়েই হারুও ওদের চৌকাঠে পা দিয়েছে।

ওকে দেখেই পারুল বৌদি কেমন যেন কঠিন হয়ে গেলেন। সাধারণ চেহারার মানুষ, কিন্তু মুখখানায় এমন একটা সহজ প্রসন্নতার ভাব আছে যে, দেখতে ভাল লাগে। এখন হারুর দিকে চোখ পড়ামাত্র নিমেষে সে প্রসন্নতা মিলিয়ে গিয়ে মুখের শুষ্ক রেখাগুলো কঠিন ও রুক্ষ হয়ে উঠল। দৃষ্টি বিরক্তি আর বিদ্বেষে ছুরির মতোই শান দেওয়া মনে হ'তে লাগল। একমুহূর্ত সেইখানে স্থির হয়ে থেকে মুখ-ঘুরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন আবার।

তখন একটা পা এমনভাবে তোলা হয়ে গেছে যে, সেটা ভেতরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। সে মুহূর্তকাল সময়ের মধ্যে সেটা সামলে নেওয়া যায় না। আবার ঠিক তখনই ফেরা যায় না, বড় খারাপ দেখায়। পাড়ার লোক কেউ দেখলে চোর ভাববে। তাছাড়া হার মেনে নেওয়াও হয় এদের এই বিশ্রী ধারণার কাছে। কেন না আরও ক'জোড়া চোখ তাকে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করেছে পারুল বৌদির এই নিঃশব্দে অপমান ক'রে যাওয়াটাও। সে যে অপমানিত বোধ করেছে সেটা বুঝতে দেওয়া আরও বেশী লজ্জার।

অগত্যা তাকে আরও কয়েক পা ভেতরে ঢুকতে হ'ল।

রান্নাঘরের চৌকাঠে বসেছিলেন নিমুর বিধবা দিদি বীণা। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যেন একটা হাই চাপবার মতো ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'কী রে, হঠাৎ! কী মনে ক'রে?'

গলার আওয়াজ স্পষ্টই বিরস। এখানে এ বাড়িতে হারুর আসাটা যে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সেটা যেন গলাতেই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন।

এদের বাড়ির একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে একটা জানলা ছিল, সেইটেই বন্ধ ক'রে কুলুঙ্গীর মতো করা হয়েছে। স্থানাভাবে সেইখানেই এখন লক্ষ্মী থাকেন। ওপরে চিলে-কোঠায় একটা ঠাকুরঘর ছিল, সেজ ভাইয়ের বিয়ের পর সেটাতেই বাচ্চুর শোবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে—ঠাকুরদের এইখানে নামিয়ে এনে—এই পথের ধারে।

হারুর অনুমানই ঠিক। ঐখানে বসেই এতক্ষণ নিমুদার মা নিশ্চয় পাঁচালী পড়ছিলেন। বোধহয় এইমাত্র সেটা শেষ হয়েছে। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে ডাকলেন, 'কৈ গো বড় বৌমা, কোথায় গেলে ? এসো এসো। এই পেসাদগুলো ধরো। সবাইকে ভাগ ক'রে দাও 'সে।'

তারপর গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে—যেন অনুপস্থিত ও আপাত-অদৃশ্য বড় বৌকে কতকটা সান্ত্বনা দেবার মতো ক'রেই বলেন, 'চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—সেই হয়েছে তোমার। তোমার বাড়ি তোমার ঘর, তুমি গিন্নী এ বাড়ির—তুমি কেন পরের লজ্জায় লুকিয়ে বেড়াবে! হাগুন্তির লাজ নেই দেখুন্তির লাজ! ··আর ওর ওপর রাগ করাও মিথ্যে। ওর দোষ কি ? তুমি নিজের ঘর সামলাতে পারো না, চোরে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে এ আর আশ্চয্যি কি! চোরের ধম্ম চুরি করা সে করেছে। তাতে চোরের গুষ্টিবগ্‌গকে দুষে তো লাভ নেই।···আর ও অত কি জানে! পাড়া সম্পক্কে দাদা বলে, দেখছে য়্যাদ্দিন, আসাযাওয়া তো সেই শিশুকাল থেকে—তাই আসে। ওর ওপর টাঁইস করা মানে নিজেরাই ছোট হওয়া।'

হয়ত আরও কিছু বলেন। বলেই যান একটানা সুরে—অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো ক'রে। কিন্তু হারু আর শুনতে পারে না। শুনতে পায়ও না। অপমানে কানমাথা দিয়ে তখন আগুন বেরোচ্ছে তার, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ উঠছে একটা। সে আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। পা ভেঙে পড়ছে ঠিকই—তবু, এখানে আর নয়। একান্ত

হাঁটতে না পারে পথেই কোথাও বসবে। পথে পড়ে মরে—সেও ভাল।

নিমুদের বাড়ির দরজা পেরিয়ে একটুখানি খোলা হাতা, হাত-চারেকের মতন, তারপরই একটা ফটক। কাঠের ফটক—একদিকের দরজা ভেঙে কাত হয়ে আছে, এখন আর বন্ধ হয় না। ফটকের পরেই রাস্তা।

ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই কে কাঁধে হাত দিল। চমকে চেয়ে দেখল—নিমুদা। নিমুদা আপিস থেকে ফিরছে। অন্ধের মতো বেরিয়ে আসছিল কোনদিকে না চেয়ে তাই এতক্ষণ দেখতে পায় নি। একেবারে সামনে আসতেও লক্ষ্য করে নি।

নিমু ওর মুখের ভাব অত তাকিয়ে দেখে নি। ওকে দেখে একটু অবাক হয়েছে এই পর্যন্ত—আজকাল বড় একটা আসে না, নিজেই এসেছে দেখে খুশীও হয়েছে। লজ্জায় অপমানে, সারাদিনের হতাশাবোধে আত্মধিক্কারে এবং ক্ষিদেয় তেষ্টায়, শারীরিক ক্লান্তিতে—সব মিলিয়ে হারুর দুই চোখে যে জল ভরে এসেছিল—সেই জন্যেই কিছু দেখতে পাচ্ছে না আরও—তাও বুঝতে পারে নি। সে বেশ হাসি-হাসি মুখেই বলতে গেল, 'কী রে, আমাদের বাড়ি গিছলি?...তা এখনই চলে যাচ্ছিস কেন?...কিছু খেলি? চা দিয়েছিল তোর বৌদি?'

হারুর মনে হ'ল ওর কাঁধের কাছটায় যেন কিসে কামড়াচ্ছে।

কাঁধের এক ঝটকায় নিমুর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে 'ধ্যেৎ' বলে তেমনিই অন্ধের মতো টাউরি খেতে খেতে চলে গেল।

এইবার যাবার সময় সামনের রাস্তার আলোটা মুখে এসে পড়তে ওর চোখের সজল অবস্থাটা চোখে পড়ল নিমুর। সে জল বোধহয় এতক্ষণ চোখের পাতার মধ্যেই আটকে ছিল, এখন ঝরে পড়ছে ঝরঝর ক'রে।... ...

নিমু কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই।

এর মানে তার না বোঝার কথা নয়। তার বাড়ি থেকে অমনভাবে হারুর বেরিয়ে যাওয়ার মানেটা।

তাছাড়া মায়ের 'চণ্ডীপাঠ' এখনও থামে নি। উপলক্ষ চলে গেলেও, বলার ঝোঁক এবং সুযোগ এসে গেছে—সহজে থামতে পারবেন না। শুধু মা-ই নয়, দিদি, মেজবৌ সব বেশ মুখর হয়ে উঠেছে মুখরোচক প্রসঙ্গটা নতুন ক'রে তোলার সুযোগ পেয়ে।

শুধু পারুলেরই কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া অবশ্য সম্ভবও নয়। কারণ এদের এই অল্পকটু কথাগুলো হঠাৎ শুনলে যদিও মনে হবে পারুলের ওপর সহানুভূতিতেই এদের এত দাহ কিন্তু আসল কথা যে তা নয়—সেটা নিমু অনেকদিনই জানে, পারুলও এতদিনে বুঝেছে। পারুল যে তার স্বামীকে বাঁধতে পারে নি, সে অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত—এটা নিমুর মা, দিদি, ভাদ্রবৌরা—সবাই বেশ উপভোগ করে। এ বাক্যবাণ না নিমু না সেই স্ত্রীলোকটি কাউকেই বিঁধছে না, তাদের কারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না—এ তো একটা পাঁচ-ছ' বছরের বাচ্চারও জানার কথা। এরাও তা জানে। পারুল বড়লোকের মেয়ে, অন্ততঃ এদের তুলনায়—দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী—সে যখন বৌ হয়ে এল তখন তার একটা—অদৃশ্য এবং হয়ত বা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন—অহংকার আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন নিমুর মা আর দিদি বীণা। সে অহংকার চূর্ণ হয়েছে, ঘরে-বাইরে আজ সকলেরই করুণার ও উপহাসের পাত্র পারুল—এতে ওঁরা খুব খুশী। তাই এই সহানুভূতি প্রকাশের সময়গুলোতে বেশ একটা বিজয়গর্ব অনুভব করেন। অপরের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত ধারালো এই কথার অস্ত্রগুলো পারুলের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের কাজ করে, জ্বালাটা দুঃসহ ক'রে তোলে, তাকে ঘরে বসে কাঁদতে হয়, এর চেয়ে তৃপ্তিদায়ক ঘটনা আর কী আছে!

নিমু যখন সদর দরজা পার হয়ে উঠোনে পড়ল তখন ওর মা বলে যাচ্ছেন, 'তা সত্যি বাপু, এমন বেহায়া বেশরম বংশ যদি

আমার য়্যাত্‌খানি বয়সে দুটি দেখে থাকি! মুখে বলি ছেলেমানুষ কিন্তু সত্যি তো আর কচিখোকা নয়, কোন্ না উনিশ-কুড়ি বছর বয়স হ'ল—ও না জানে কি? কোন্‌টা ওর জানতে বাকী আছে? কিসে কি হয় জানে না, না বোঝে না! আমাদের ওনার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন আমার তুই পেটে এসে গেছিস।...মার কেলেংকারি বোঝবার বয়স হয় নি ওর! পাড়ার লোক যে ঠেস দিয়ে দিয়ে নিত্যি টিটকিরি দেয়—তাতেও কি মাথায় ঢোকে না তার অর্থগুলো!...তা নয়, ওদের সব্বাইকার, ঝাড়গুষ্টির গণ্ডারের চামড়া যে! কোন কথাই গায়ে লাগে না। সেই যে বলে না বেহায়ার পেছনে গাছ বেরিয়েছে, বেহায়া বলে আমার ছায়া হয়েছে —তা ওদেরও তাই।'

দিদি মায়ের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে বলেন, 'তুমি থামো দিকি! বেহায়া না আরও কিছু! আসলে বজ্জাত। হাড় বজ্জাত ওরা। মজা দেখতে আসে। অপ্‌মান করতে আসে আমাদের।'

মা বোধকরি ওকে থামিয়ে আবারও নিজের কথার খেই ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।

নিমুর বাড়ি ঢোকাটা এতক্ষণ টের পান নি ওঁরা। এবার একেবারে সামনে এসে পড়াতে থতমত খেয়ে থেমে যেতে হ'ল সবাইকেই। মার মনে পড়ল প্রসাদটা এখনও তাঁর হাতেই থেকে গেছে—তিনি আবার হাঁক পাড়লেন, 'কৈ গো, কোথায় গেলে গো বড় বৌমা, পেসাদটা ধরো না, আমায় ছুটি দাও!'

'ঐ পেসাদ হাতে নিয়ে এতক্ষণ কোন্ ভাগবত পাঠ হচ্ছিল শুনি! ও ছাই-ভস্ম পূজো ক'রে লাভ কি! লক্ষীবার, সন্ধ্যেবেলা —এই সব পাঁচালীই যদি গাইতে হয় তো মিছিমিছি এ পূজোর ভড়ং করা কেন?'

নিমাই বেশ চড়া সুরেই ধরতাইটা ধরে। শব্দগুলো ব্যঙ্গোক্তির উপযোগী হ'লেও গলার আওয়াজে নির্ভেজাল অম্লরসের আভাস মেলে না, বিরক্তি ও বীতরাগের তিক্ততাই প্রকাশ পায়।

'তা কী করব বলো বাছা', মা-ও সমান স্থরে উত্তর দেন, 'লক্ষ্মীবার সন্ধ্যেবেলা যদি ঢং ক'রে তোমার হাঁটানে-বেটা আসেন গায়ে দুধ তুলতে—তাহলে মেজাজ খিঁচড়ে যায় বৈকি! তখন আর অত মধুর বাক্যি মুখ দিয়ে বেরোয় না, দাঁড়া-গো-পান দিয়ে তাকে অভ্যত্থনা জানাতেও ইচ্ছে করে না। ঐ বৌটার মুখের দিকে চেয়ে বুকটা যে রহরহ ফেটে যায়, মিষ্টি বাক্যি মনে রাখি কি ক'রে।'

'থামো, ঢের হয়েছে। বৌটার মুখের দিকে চেয়ে যদি বুক অত ফেটেই যেত তাহলে ভাবনা ছিল না।···বুক ফেটে যায় বলেই বুঝি তার বুকটাও ফাটাচ্ছ চোদ্দগুষ্টি মিলে! এ কথাগুলো তো আর কেউ শুনতে আসছে না—ও-ই শুনছে!'

তারপর—বীণা কি বলতে চেষ্টা করছে লক্ষ্য ক'রেই আরও এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলে, 'আর হয়েছেই বা কি, আমি কার সঙ্গে কি করি কেউ দেখেছে? কেউ জানে? যাদের নোংরা মন—নোংরা চরিত্র—লোক দেখানো বারব্রেত ধর্ম করে, আর কোথায় কি দুগ্‌গন্ধ আছে শুঁকে বেড়ায়—তারাই নিজেদের মতো ক'রে সবটা ভেবে নেয়, নিজেদের মতো ক'রে সব্বাইকে দেখে। নিজের বোন বলে কিছু বলি না, আকাশের গায়ে থুথু ফেললে নিজের গায়েই এসে লাগে—গোবিন্দ দারোগাকে কেন এখানের বাড়ি বেচে চলে যেতে হ'ল তা কি জানি না, রাত-দুপুরে কেন নিষ্ঠেবতী বিধবা মাংসের বাটি নিয়ে ছুটেছিল!···যাকে উদ্দিশ ক'রে বলা হচ্ছে তার কোন ক্ষেতিই হবে না—তোমাদের নিজেদেরই স্বভাব শিক্ষা জানছে পাড়ার লোক। আমি কি করি না করি সে আমি বুঝব, ঢের বয়েস হয়েছে আমার। যাদের ভাল না লাগবে তারা যেন অন্য কোথাও চলে যায়। আমি এত হীন চরিত্রের লোক জেনেও আমার পয়সায় খেতে তো কৈ ঘেন্না হয় না!'

'কী, কী বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? বলি তোর বাড়িতে আছি আমি! তুই করেছিস এত বড় সম্পত্তি! তোর না পোষায় তুই-ই দশহাত তফাতে যা না!'

মা একেবারে ক্ষেপে ওঠেন যেন। প্রসাদটা মেঝেতেই নামিয়ে রেখে উঠোনে নেমে এসে যেন ধেই ধেই ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দেন।

নিমু কিন্তু দমে না, সমান তালে জবাব দেয়, 'তোমার বাড়িতেও আমি নেই। পৈতৃক বাড়ি আমি ইন্‌হেরিট করেছি। আমার ভাগে আমি আছি। বাবা তোমার নামে অনেক টাকা রেখে গেছলেন, তার প্রমাণ আছে— তুমি ছোট ছেলেকে রেস খেলার টাকা যুগিয়ে কি জামাইকে ব্যবসা করতে দিয়ে উড়িয়েছ, সে তুমি জানো —মোদ্দা ছেলেরা তোমার খোরাকী দিতেও বাধ্য নয়।·· সেটা বিশ্বাস না হয় কোন উকীলকে জিজ্ঞেসা ক'রো—না হয় আদালত খোলা আছে, নালিশ ক'রে ছেলেদের কাছ থেকে খোরাকী আদায় ক'রো। একটা বিধবার কি প্রাপ্য আদালতই বলে দেবে—তিন ছেলে তোমার—তিন ভাগের এক ভাগ দোব তখন। তোমার, তোমার বিধবা মেয়ের সব খরচ টানব— এমন আইন নেই।'

এর পর যা শুরু হ'ল তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

এ অভিজ্ঞতা—যাঁরা কোন বস্তির ধারে কাছে বাস করেন তাঁদের প্রায়ই হয়, তথাকথিত ভদ্রঘরেও যে হয় না তা নয়। সকলেই অল্পবিস্তর অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।

নিমু কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না এই তাণ্ডব নৃত্যে। যেন কিছুই হয় নি, সে কাউকে কোন মর্মান্তিক আঘাত দেয় নি—এমনি ভাবেই ঘরে ঢুকে অন্যদিনের মতো ধীরে সুস্থে প্যাণ্ট শার্ট ছাড়ল, বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে নৈশসাজ পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়ল আবার। এ-ই তার নিত্যদিনের 'রুটিন'। অন্যদিন—অন্য বেস্পতিবার একটু লক্ষ্মীর প্রসাদ মুখে দেয়—বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্যে করা লুচি পরোটা দু'একখানা থাকলে তাও খায়। বা খায় না, সেটা ও বাড়িতে বাঁধা। আজ আর কিছু খাবার চেষ্টাও করল না। অপরে কিছু অনুরোধ ক'রে খাওয়াবে সে আশা আর নেই।

উঠোনে মা আর বোনে মিলে চেঁচিয়ে কেঁদে গাল দিয়ে শাপ-শাপান্ত ক'রে হাট বাধিয়ে তুলেছে—পাড়ার লোক জানলা দিয়ে উপভোগ করছে মাঝখান থেকে—স্ত্রী ঘরে পড়ে কাঁদছে, এখন তার খাওয়ার দিকে কেউ মনোযোগ দেবে তা সম্ভব নয়। সেও কাউকে বলবে না। বলার দরকারও নেই। হারুদের বাড়িতে অশ্রু কাকীমা মুখ দেখেই বুঝবে কিছু খাওয়া হয়েছে কিনা, সে-ই ব্যবস্থা করবে।

নিমু অন্যদিনের মতো সহজভাবেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। আজকাল এ ধরনের চেঁচামেচি হ'লে পাশের বাড়ি থেকেও কেউ আসে না। এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে আর মজা কি রস নেই। বরং অপ্রসন্নই হয় সকলে—এই ধরনের কচকচিতে। মজা থাকত যদি নিমুকে লক্ষ্য ক'রে যে সব বাঁকা কথা ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষিত হয়—নিমু তা গায়ে মাখত।

নিমুরও গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিছুতেই আর তার কোন বিকার হয় না। সন্ধ্যাবেলায় এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যে আনন্দ ও শান্তিটুকু ভোগ করে সে—এ অশান্তি ও আঘাত তারই দাম বলে ধরে নিয়েছে। 'ভাল জিনিস পেতে হ'লে ভাল দামও দিতে হবে বৈ কি' মনকে বোঝায় সে। আগে আগে তার দু-চারজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বা বান্ধবকেও বোঝাত—এখন আর বন্ধুবান্ধবই কেউ নেই তার বিশেষ। আপিস থেকে ফিরেই যদি কেউ একটা কোটরে ঢোকে এবং দীর্ঘরাত পর্যন্ত সেখানে কাটায় তাহলে তার বন্ধু থাকা শক্ত।

সকালে সাতটায় ঘুম থেকে ওঠে; বাজার-হাট ডাক্তার-ওষুধ ছেলেমেয়েদের আবদার প্রয়োজন মেটাতে মেটাতেই আপিসে বেরোবার সময় হয়ে যায়। এক-একদিন মাত্র পনেরো মিনিটে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে খেয়ে ট্রেন ধরতে হয়। এর মধ্যে খোশ গল্প করা কি আড্ডা দেওয়ার সময় কোথায়? সপ্তাহে একটা রবিবার—সেদিন তো এক মিনিটও অবসর থাকে না। রেশন আছে, কয়লা কেরোসিনের সমস্যা আছে—কাপড় জামা কাচা ইস্ত্রী

করা—এই করতে করতেই সকাল বিকেল কেটে যায়। দুপুরটায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বসে—সন্ধ্যায় কোন কোন দিন—ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোন মা ভাজ স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটার যেতে হয়। তা নইলে হারুদের বাড়ি তো আছেই। এর মধ্যে আর বন্ধুদের আড্ডায় যোগ দেবার সময় কোথায় ?

॥ ৫ ॥

রাস্তায় পড়ে একটা সিগারেট ধরাল নিমু।

পা তার অভ্যস্ত পথ ধরেছে—সেজন্যে কোন চিন্তার কি মনোযোগ দেবার দরকার নেই। সে ভাবছিল অন্য কথা। তারও আজ এতদিন পরে প্রথম মনে হয়েছে, এইমাত্র মনে হ'ল—তার জীবনে এ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! এ কি এক অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসল তাকে!

কী পাচ্ছে সে, কী পায়—কিসের লোভে কি কামনায় এমন ভাবে ছোটে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারোমাস, এমন কি এককোমর রাস্তার জল ভেঙেও,—প্রতিদিন? এরা এদের মতো অর্থ ক'রে নিয়েছে, সেজন্যে এদের ও দোষ দিতেও পারে না—অপর যে কেউ হ'লেও এই অর্থই করত। সেও তো এদের কোন বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাব্য কারণ দেখাতে পারে না।···কিন্তু শুধু কি দেহের আকর্ষণে দেহের লালসা মেটাতেই সে ছোটে! কখনই না, তাতে এমন নেশা হয় না।

আসলে নিজেই ও জানে না এ কী, কিসের আকর্ষণ—কেন এমনভাবে ছোটে!

অথচ সূত্রপাতটা কি সামান্য ব্যাপারেই না হয়েছিল।

কত স্বাভাবিকভাবে।

এমন ঘটনা প্রত্যেকের জীবনেই ঘটতে পারত, ঘটেও। আজও মনে হ'লে অবাক লাগে, তাকে নিয়ে ভাগ্যের এ কী খেলা—ভাবতে বসলে। একেই কি গ্রহ বলে, গ্রহের ফের?

রাখালবাবুর দুর্ঘটনা দিয়েই এ ঘটনার শুরু।

আসলে এটা নিমুরই জীবনের প্রধান দুর্ঘটনা একটা।

দুর্গ্রহ। দুর্ভাগ্য।

অথবা সৌভাগ্যই।

নিমু যা পেল—যে আনন্দ আর শান্তি—যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা, যে কোন কারণে যে কোন উপলক্ষেই হোক—সহজে কেউ পায় না, এটা নিমু জোর ক'রেই বলতে পারে। এ পর্যন্ত অনেক দেখল, অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছে—সাধারণ জীবনযাত্রার সাধারণ সুখ-দুঃখের মানুষ তারা—এ অভিজ্ঞতার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এ তৃপ্তি। এর জন্যে জন্ম জন্ম ঘরে-বাইরে গঞ্জনা শুনতে প্রস্তুত আছে সে।

কাজেই, ঘটনাটাকে কি বলবে—কু না সু—আজও ঠিক করতে পারে নি।

আপিসের ফেরত শিয়ালদার মোড় পেরোতে, পাশ-কাটানোর-চেষ্টায় উন্মত্ত একটা ট্যাক্সীর ধাক্কা লাগে রাখালবাবুর। সে ট্যাক্সীতে চাপা পড়েন নি, তাহলে তো মারাই যেতেন বোধ হয়, অল্পের ওপর দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ট্যাক্সীকেই বাঁচাতে অন্য একটা সওয়ারীসুদ্ধ রিক্সা পায়ের ওপর দিয়ে চলে গিছল বলে।

কয়েকজন পথচারীই তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল। তার মধ্যে এ পাড়ার একটি ছেলেও ছিল। সে এসে খবর দিয়েছিল অশ্রু কাকীমাকে। চেনা ছেলে, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। তার সঙ্গেই যাওয়ার কথা—কিন্তু সে নিয়ে যেতে রাজী হয় নি হাসপাতালে। স্কুলের ছেলে, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে এইসব ঝামেলায়, মাস্টারমশাই এসে বসে আছেন নিশ্চয়, আরও দেরী ক'রে গেলে বাবা বকবেন, বদরাগী রগচটা মানুষ তিনি।

অশ্রু আর কাকেও বলে নি। কাউকে সঙ্গে নেবার চেষ্টা ক'রে সময় নষ্ট করে নি। হারুকে বাড়িতে রেখে বাইরের দোরে তালা

লাগিয়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছু টাকা নেওয়া দরকার এইটুকু শুধু হুঁশ ছিল, তাও ব্যাগ নিতে তর সয় নি। বাইশ-তেইশটা টাকা হাতেই মুঠো ক'রে নিয়ে চলে গিছল।

বাড়িতে আর কেউই ছিল না। সেই জন্যেই চাবি দেওয়া। তার আগে হারুর জ্যাঠা আলাদা হয়ে গেছেন। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে গেলেন, পাছে একসংসারে একান্নবর্তী থাকলে পরে কোনদিন ভাগ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে– আইন ঠিক জানেন না, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা জ্ঞানের আতঙ্ক একটা ছিল সেই জন্যে—সেই অমূলক ভয়েই তাড়াহুড়ো ক'রে চলে গেছেন বরানগরের কাছে কোথায়। তখন সেই গোটা বাড়িটার খরচই রাখালবাবুর ঘাড়ে চাপতে কোনমতে ছোট্ট এই বাড়িটা করেন তিনি। হারুর ঠাকুমা তখনও বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনিও বড় ছেলের বড় বাড়িতে থাকতেন বেশির ভাগ। এইটুকু বাড়িতে নাকি তাঁর হাঁফ ধরত। আসলে এ সংসারের অসচ্ছলতাই তাঁর এই হাঁফ ধরার প্রধান কারণ।

হারুর তখন মোটে সাত-আট বছর বয়স।

একা একা বাড়িতে এমনি চাবি বন্ধ হয়ে থাকা—ভাড়াটের ব্যবস্থা হয় নি তখনও, তার ওপর বাবার কি হয়েছে ঠিক না বুঝলেও, খুব বড় রকমের কিছু একটা বিপদ হয়েছে—এটা ধরে নিতে পেরেছিল। দু'রকম ভয়েই পথের দিকের জানলায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছিল সে।

নিমু আগেও আপিস থেকে এসে এই সময়টা বেড়াতে বেরোত। তফাতের মধ্যে তখন বাড়িতেই কিছুটা বিশ্রাম ক'রে চা জলখাবার খেয়ে বেরোত। স্টেশনে ওভারব্রীজের ওপর ওদের একটা আড্ডা ছিল তখন, কিন্তু সেখানে রাত আটটার আগে আড্ডাধারীরা জড়ো হ'ত না। সকাল ক'রে যাওয়ার কোন তাড়া ছিল না তাই।

নিমুদের বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার এইটেই সোজা রাস্তা।

সামনে দিয়ে যেতে যেতে ছেলেটা অমন ক'রে জানলায় বসে কাঁদছে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিমু।

'কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন অমন ক'রে? বাবা ফিরেছেন? কই, রাখালবাবু কই?--আরে, এ যে বাড়িতে চাবি দেওয়া! ব্যাপার কি রে? বল বল—'

পাড়ার লোক, খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরিচয় আছে, ছেলেটাকে দু'বেলাই দেখছে যাতায়াতের পথে-- কৌতূহল স্বাভাবিক। তাছাড়া—এটুকু কর্তব্যও। যদিই কোন বিপদ-আপদ হয়ে থাকে!

হারু কাঁদতে কাঁদতেই খবরটা দিল।

য়্যাক্সিডেন্ট শব্দটার মানে না বুঝলেও শব্দটা মনে ছিল। মা গেছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এটাও শুনেছে। সেইখানেই নাকি আছে তার বাবা।

নিমু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'কে সঙ্গে গেছে? আর কাউকে খবর দিয়েছিল?'

'মা একাই গেছে। জগাদা খবর দিয়েছিল কিন্তু সে যেতে পারে নি। মা আর কাকেও বলে নি। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে। ব্যাগটাও নিয়ে যায় নি।'

এমন কোন আত্মীয়তা কি বন্ধুত্ব নেই সত্য কথা—কিন্তু কোন অচেনা লোকও বিপদে পড়লে তাকে দেখতে হয়। এ তো পাড়ার লোক, পরিচিত--এতটা বিপদ, হয়ত বা জীবনসংশয়ই ঘটেছে—এখানে তো কাছে গিয়ে দাঁড়ানো অবশ্য কর্তব্য। তার ওপর অল্প-বয়সী বৌটি ঐ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে—বদলোক দেখলেই এ অবস্থার সুযোগ নিতে চাইবে। পথেঘাটে গুণ্ডা বদমাইশের অভাব তো নেই। তাতে বিপদের ওপর বিপদ ঘটবে, টাকাও যাবে, জীবনও নষ্ট হবে। অথচ সে ভদ্রলোকেরও কোন উপকার হবে না।

এক্ষেত্রে একটি মাত্রই কর্তব্য সে বুঝেছিল—তখনই ছুটে চলে যাওয়া।

তাই গিছল সে।

বাড়ি ফিরে টাকার ব্যাগটা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল আবার।

কাউকে ডাকার চেষ্টা করে নি আর, অনর্থক হয়ত সময় নষ্ট সার হবে। কে বাড়ি ফিরেছে না ফিরেছে, কার কাজ আছে, মর্জি কি রকম—কিছুই তো জানা নেই। বললেই যাবে এমন কারও কথা মনেও পড়ে নি।

দরকারও ছিল না কারও। ভগবানের ইচ্ছেয় টাকার খুব অভাব কোনকালেই নেই তার। বাবার অবস্থা ভাল ছিল, তিনিই আঠারো বছর বয়েসে ভাল চাকরিতে বসিয়ে গেছেন। রেলের পার্শেল আপিসে কাজ, মাইনেটা সেখানে তুচ্ছ। নিমুর আয় আরও বেশী। উপরি সব একত্র হয়ে যে বেলায় যাদের ডিউটি তাদের মধ্যে সমান ভাগ হয়, কিন্তু নিমুর একটু বিশেষ ক্ষমতা হাতে থাকায় পৃথক ক'রেও কিছু দিয়ে যায়—নিয়মিত যাদের মাল পাঠাতে হয়—বড়বাজারের বড় কারবারীরা। স্বেচ্ছাতেই দেয় একরকম, চাইতে হয় না।

আর যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাদের কারও দ্বারস্থ হবার বিশেষ দরকার পড়ে না।

পথে বেরিয়ে সামনে একটা ট্যাক্সী পেয়ে ট্যাক্সীতেই উঠে পড়েছিল, সময়ও বেশী লাগে নি। দেখা গেল ওর তাড়াতাড়ি পৌঁছানোরই দরকার ছিল। হাসপাতালের লোক বেশির ভাগই হয় বুভুক্ষ নয় উদাসীন। অশ্রু মেয়েছেলে, এর আগে কখনও এমন অবস্থায় পড়ে নি, কোথায় গিয়ে খোঁজ করতে হবে তা-ই জানে না, ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করছে—মাকুর মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টানা দিচ্ছে—ঠিক সেই সময়েই গিয়ে পড়েছিল নিমু।

নিমুরও সেই প্রথম—হাসপাতালে হাতেখড়ি। কিন্তু অনেক দিন পার্শেল আপিসে কাজ করার ফলে তার পরিচিত লোকের সংখ্যা অনেক, উপস্থিত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাও বেশী। সে এক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটার হাল ধরে নিল। দু' এক টাকা খরচ করতেও তার কুণ্ঠা ছিল না। দারোয়ান ওয়ার্ডবয়দের 'চা' খাওয়াবার

ব্যবস্থা করতেই সব দোর খুলে গেল। একটি পরিচিত হাউস-সার্জেনকেও পাওয়া গেল। অর্থাৎ রাখালবাবুর সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি রইল না।

এর পর একমাস হাসপাতালে ছিলেন রাখালবাবু। ছুটোছুটি তদ্বির এবং অর্থব্যয় যথেষ্ট করেছে নিমু। কেন করেছে তা জানে না। অপর কোন সাধারণ স্বল্পপরিচিত প্রতিবেশী সম্বন্ধে কেউ করে কি-না, সেও ঠিক প্রতিবেশী হিসেবে করেছে কি-না—এত ভেবে দেখে নি। সে সম্বন্ধে সচেতন হবারও সময় আসে নি। একমাস পরে বাড়ি ফিরে আরও মাসখানেক শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল রাখালবাবুকে। তখনও ঢের কাজ। আপিসে চিঠি পৌঁছানো, মাইনে আনা, এখানের বাজার-হাট রেশন, ডাক্তার ওষুধ, হারুর কোচিং-এর মাস্টার ঠিক করা—সবই নিমুকে করতে হয়েছে। অথবা সে-ই করেছে আগ-বাড়িয়ে। আপনার লোকের মতো, অভিভাবকের মতোই সব দায়িত্ব পালন করেছে সে, স্বেচ্ছায়—আদালতের ভাষায়—অন্যের বিনানুরোধে।

শুধু সামর্থ্য নয়, অর্থেও করতে হয়েছে। অশ্রু সেজন্যে কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেছে, বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, নিতে হচ্ছে বলে বিলাপও করেছে। দু' একবার, সামান্য যা দু'চার গাছা চুড়ি অবশিষ্ট আছে—বাকী গয়না বাড়ি করার সময়েই গেছে—খুলে দিতে চেয়েছে, বলা বাহুল্য নিমু তা নেয় নি।

রাখালবাবু অবশ্য নির্বিকার থেকেছেন। কিসে কি হচ্ছে, এত খরচ তাঁর সামান্য আয়ে হওয়া সম্ভব কি-না—এসব অসুবিধাজনক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান নি, সচেতন হবার চেষ্টাও করেন নি। করলে—এই সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসা হয়ত বিষ হয়ে উঠত।

সেই যে নিত্য যাতায়াত শুরু হ'ল—আর বন্ধ হ'ল না।

আজও হয় নি।

দুঃখের বিপদের দিনে দিশাহারা অশ্রু একমাত্র অবলম্বন হিসেবে একান্ত নির্ভরতায় নিমুকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেটা স্বাভাবিক।

আর কেউ এসে সেদিন দাঁড়ায়ও নি। সহানুভূতি যথেষ্ট থাকলেও অভাবের সংসারে বিপদের দিনে কেউ এসে দাঁড়াতে চায় না। সুতরাং সেদিন নিমুই ছিল একমাত্র, ভগবানের মতোই সেদিন মনে হ'ত তাকে।

বিপদ কেটে গেলেও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত অশ্রু নিমুকে ছাড়তে চাইল না। সেটাও স্বাভাবিক। তার যা সামর্থ্য—সামান্য উপকরণে যথাসাধ্য আদর-যত্ন করত, উপকরণের দৈন্য আন্তরিকতায় ঢেকে দেবার চেষ্টা করত। অবশ্য ক্রমে সে দৈন্যও থাকে নি, নিমুই তা দূর করেছে। বড় বড় ফার্ম তাকে হাতে রাখতে চাইত। মহার্ঘ্য চা, দুষ্প্রাপ্য সুগার কিউব, ভাল কাপ, ভাল বিস্কুট—কোনটারই অভাব ছিল না। উপকার না হোক, অপকার করার কিছু শক্তি ছিল নিমুর, সেই জন্যেই পূজো চড়াত সবাই। এখন বরং টানাটানি পড়েছে কিছু, ওর এই একাধিপত্যে অন্য সহকর্মীরা স্বভাবতঃই ঈর্ষিত হয়ে সেই অপকারের শক্তিতেও ভাগ বসিয়েছে। তাদের আপত্তি আন্দোলনের আকার ধারণ করছে দেখে নিমুই মিটিয়ে নিয়েছে—পণ্ডিত ব্যক্তির মতো অর্ধেকাংশ সমর্পণ ক'রে সব যাওয়ার সম্ভাবনাটা বাঁচিয়েছে, তাছাড়া মাথার ওপর যে পাঞ্জাবি অফিসারটি এসেছেন, তিনি ছাড়া—অর্থে বা উপকরণে অন্য কেউ কোন ঘুষ পায়, সেটা আদৌ পছন্দ করেন না।

কিন্তু সে সময় ঘি মাখন ময়দা কিছুরই অপ্রতুলতা রাখে নি নিমু। আমের সময় আম, লেবুর সময় কমলালেবু দেদার এনেছে।

ফলে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতা বেড়েই গেছে।

এ বাড়ি নেশার মতো পেয়ে বসেছে নিমুকে।

এবার, এই সম্প্রতি, এ নেশা সম্বন্ধে নিমু নিজেও সচেতন হয়ে উঠেছে। প্রশ্নও করেছে নিজেকে। বার বারই এ প্রশ্ন করেছে। উত্তর খুঁজেছে নিজের প্রবৃত্তি ও আকুতিকে বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে—কাপড় ছিঁড়ে সুতো আলাদা করার মতো, ইংরাজীতে যাকে 'থ্রেডবেয়ার' বিশ্লেষণ বলে—কিন্তু কোন সদুত্তরই পায় নি।

কি ছিল অশ্রুর মধ্যে, আজও কি আছে—কিছু আছে তো নিশ্চয়ই—তা নিমু জানে না।

ওর আপিসে এক নতুন ছোকরা এসেছে, বেশী লেখাপড়া না জানলেও ইংরেজী বই ও সাময়িক পত্র পড়ে খুব, সে কথায় কথায় বলে 'সেক্স্ য়্যাপীল'। ব্যাখ্যা ক'রে বলে, 'চেহারা ফেহারা কিছু নয় দাদা, সেক্স্ য়্যাপীলই হ'ল আসল। যা আপনার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবে, ক্ষিদে বাড়াবে, যাতে ক্ষিদে মিটবেও—তার আবার বর্ণনাই বা কি, গুণাগুণই বা কি! দেখেন না মেরিলীন মনরোকে দেখার জন্যে লোকে কি পাগল হ'ত! মাংসর ঢিপি মে' ওয়েস্টের জন্যে আমার বাবা কাকা পাগল ছিল! ও আলাদা জিনিস!'

এও কি তাই?

নিমু মনে মনে বোঝার চেষ্টা করেছে, মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে।

অশ্রু দেখতে যে খুব ভাল তা নয়। নেহাতই সাধারণ। বরং কথাটা উল্‌টে ধরে—খারাপ নয় বললেই ঠিক বলা হয়। উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, বয়সেও নিমুর থেকে বড়। বৌ পারুলের চেহারা এর চেয়ে খারাপ নয়, বরং যখন হাসি হাসি মুখ চোখ তুলে চায়—ভালই লাগে। চটক আছে একটা। অন্ততঃ সেদিন ছিল, আজ হয়ত প্রাতনিয়ত সপত্নীবিষে জ্বলে জ্বলে সে হাসির আভা মুছে গেছে। তবু সেদিক দিয়ে তারই আকর্ষণ বেশী—অগ্রাধিকার।

আদর-যত্ন? পারুলও যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছে, পাঁচজনের বাড়িতে শাশুড়ি ননদের মধ্যে যতটা করা সম্ভব।

তবু অশ্রুই যেন নিমুকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে ক্রমশঃ।

কোনমতেই ছাড়তে পারে নি, ছাড়তে চায়ও নি। মনে হয়েছে এইটুকুই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা। এর জন্যে বহু দুঃখ লাঞ্ছনা সইতে হ'লেও সে ক্ষতি মনে করবে না।

একেই বোধহয় মোহ বলে। না?

মা বলেন, 'কামিখ্যের মেয়ে নিশ্চয়! অন্ততঃ সেখানের মন্তর নিয়ে এসেছে কারও কাছ থেকে। কামিখ্যে কামরূপের মেয়েরা পুরুষ পেলেই ভেড়া ক'রে রাখে শুনেছি।'

বীণা বলে, 'বাজে কথা, কোন তান্ত্রিক-মান্ত্রিক ধরে ওষুধ করেছে। গুণতুক ছাড়া এসব হয় না।'

তারাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, নিমু তা জানে। পাড়ায় এক উকীল আছেন, ওকালতি যত না হোক, এই সব গুণতুক মন্ত্রতন্ত্র ক'রে, মাদুলি কবচ দিয়ে অনেক পয়সা রোজগার করেন। অমাবস্যায় অমাবস্যায় হোম করেন বাড়িতে—অনেক বিলেতফেরত ব্যারিস্টার ডাক্তারও আসেন সে সব দিনে, টাকা ফল মিষ্টি কাপড় প্রভৃতি ভেট দিয়ে হাতজোড় ক'রে বসে থাকেন।

তাঁর কাছেও গেছেন মা। কোথায় আগরপাড়ায় কে পিশাচ-সিদ্ধ নিত্যানন্দ ঠাকুর ছিলেন, তাঁর ভাই বলরাম ঠাকুর আছেন—সেখানেও গেছেন ওঁরা পারুলকে নিয়ে। মাদুলি কবচ করিয়ে এনেছেন। কিন্তু কিছুতেই অশ্রুর আকর্ষণ কাটাতে পারে নি—কোন মাদুলি কবচ যজ্ঞেই কাজ হয় নি। ঠাকুরমশাইয়ের দল বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এ আরও কোন বড় তান্ত্রিকের, অধিক শক্তিশালী মন্ত্রের খেলা, আমাদের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশী। এ কাটাতে গেলে বিস্তর খরচা লাগবে, একাসনে সাতদিন হোম যাগযজ্ঞ করতে হবে, আমাদের শরীর খারাপ হবে—তিন মাস পুরো বিশ্রাম নিতে হবে তারপর। হাজার দশেক টাকা খরচ, পারবেন?'

অগত্যা মা দিদিকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

তবে সেই সঙ্গে গুণতুকের ব্যাপারটা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাঁদের ও অন্যান্য প্রতিবেশীদের মনে।

নিমু জানে না সত্য কি মিথ্যা; কোন মন্ত্রের ব্যাপার আছে কি-না। থাকলে সত্যিই সে মন্ত্রের জোর প্রবল—এটা মানতে হবে।

কিছুতেই কাটাতে পারে না এ নেশা, ছাড়াতে পারে না এই সান্নিধ্য সাহচর্যটুকুর লোভ। প্রতি সন্ধ্যায় কে যেন অপ্রতিহত আকর্ষণে টানে ঐ একতলা বাড়ির ভ্যাপসা গরম ঘরখানার দিকে।

॥ ৬ ॥

আপত্তি করতে পারতেন রাখালবাবু। করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি করেন নি। দিন দিন জীবনযাত্রার ব্যয় ও অসুবিধা বেড়ে যাচ্ছে, আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না। তাঁদের চাকরিতে বোনাস নেই, ঋণ শোধের সুদূরতম প্রত্যাশাও নেই কোথাও। নিমুর যদিচ আগের সে প্রতাপ বা সচ্ছলতা নেই -তারও খরচ বেড়েছে, বাড়তি আয় কমেছে—তবু যেটুকু আনুকূল্য করে সে—তাই লাভ।

এখন তো সে সব প্রশ্নই ওঠে না, এখন আর আপত্তির কারণ কি থাকবে—কিন্তু যখন ছিল, গোড়ার দিকে সাত-আট বছর—তখনও করেন নি। বরং যতটা সম্ভব রাত ক'রে আপিস থেকে ফিরেছেন। কোনদিন কোন কারণে সকাল ক'রে ফিরতে হ'লেও ছুতোয় নাতায় বেরিয়ে পড়েছেন আবার (এখনকার জীবনযাত্রায় সে অজুহাতের অভাবই বা কি)। আটটা-ন'টায় বাড়ি ফিরেও একবার হয়ত ঘরে ঢুকে কাপড়জামা ছেড়ে এসে রকে বারান্দায় বসে থেকেছেন। খোলা হাওয়ার প্রতি আকর্ষণ বেশী দেখা দিয়েছে।

বাধা আজ তো নেই-ই কোথাও, সেদিনও ছিল না।

রাখালবাবুই সেদিকে নজর রেখেছেন—বাধা না থাকে।

হারু পাড়ার একটি কলেজের ছাত্রের কাছে পড়তে যেত, সে ছাত্রটি খুচরো টিউশানীর চেষ্টা না ক'রে কোচিং ক্লাসের মতো খুলেছিল একটা—সেখানেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল নিমু। তার মাইনেও সে-ই দিত।

হারু ছেলেবেলায় এসব বুঝত না। এখন বোঝে নিশ্চয়। হয়ত বিগত দিনের কথাগুলো মনে ক'রে ক'রে এখন তার অর্থ খুঁজে পায়।

নিমুদা এসে ঘরেই বসত। ভাল চেয়ারের অভাবে খাটে বসত। মাও একটু চা জলখাবার ক'রে দিয়েই ঘরে এসে কাছে বসত। মেঝেতে মাদুর পাতা থাকত, ওদের দেখিয়ে অন্ততঃ সেখানেই বসত মা। কোনদিন নিমুদাও চায়ের কাপ হাতে ক'রে সেখানেই নেমে বসত, কোনদিন খাট থেকেই খালি কাপটা হাত বাড়িয়ে নামিয়ে দিত। কাপ দেবার বা নেবার সময় ইচ্ছাকৃত একটু দেরি হ'ত। দেবার সময় গ্রহীতার ও নেবার সময় দাতার হাতটা অকারণেই কাপের ডাঁটিটা খুঁজতে অপরের হাতের ওপর এসে পড়ত, মুহূর্ত কয়েক যেন সেখানেই খুঁজে বেড়াত ছোট কাপের আরও ছোট্ট ডাঁটিটা।

প্রথম প্রথম হারুকে অত গ্রাহ্য করত না কেউ—না মা, না নিমুদা। ওর বুদ্ধি নেই, অত বুঝতে পারবে না কিছু—এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকত। সেই সময়েই এটা লক্ষ্য করেছে হারু। ভেবেছে চোখগুলো পরস্পরের মুখের ওপর আবদ্ধ থাকাতেই হাতড়ে হাতড়ে বেড়াতে হয়।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকেই পর্দাটা টেনে দিত মা ভাল ক'রে। তার পর শুরু হ'ত গল্প, অবিরাম একটা গুজগুজ শব্দ। আর কেউই ঘরে থাকত না। মানে স্পষ্ট কোন বিধিনিষেধ ছিল না, কিন্তু রাখালবাবু ঢুকতেন না, হারু ফিরলে হারুকেও আটকে রাখতেন, ঢুকতে দিতেন না, কোন না কোন অছিলায়। পর্দাটা ছিল দরজার বাইরে—তারের স্প্রিং-এ ঝোলানো। তার ওপারে এক সময় কপাটটাও বন্ধ হয়ে যেত নিঃশব্দে।

রাখালবাবু এ সবই জানতেন বৈকি।

একটু আগে—মানে রাত সাড়ে দশটার আগে এসে গেলে—একবারও আর ঘরে ঢুকতেন না। বাইরে অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে বিড়ি টানতেন, ছেলে এলে জোর ক'রে ধরে কাছে বসিয়ে রাখতেন, সে আপত্তি করলে বলতেন, 'বড়রা যেখানে বসে গল্প করে ছোটদের সেখানে যেতে নেই।' হারুর কষ্ট হ'ত বলেই আপত্তি করত।

এমনিতেই তো কেন যে নিমুদা ফার্স্ট ব্যাচে মানে সাড়ে ছ'টা থেকে আটটার ব্যাচে না দিয়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টার ব্যাচে দিলেন কোচিং-এ, তা বুঝে পেত না নিমু। প্রথম দলে গেলে কখন ফিরে আসতে পারে সে।

কারণটা ক্রমশঃ বুঝতে শেখে সে। জীবনের অভিজ্ঞতাই শেখায়; চোখ-কান খুলে দেয়।

অভাবে পড়লেই নিমুদার কাছে হাত পাততে হয়। ধার বলেই বাবা চান প্রত্যেক বার, কিন্তু সে ধার কোনদিনই আর শোধ হয় না। না চাইতেও দেয় নিমুদা—নানা অজুহাতে—বাড়তি টাকা হাতে দেয়। জিনিসও কিনে দেয়। হারুর টেরিকটের প্যান্ট ওরই দৌলতে। মা যে ভাল ভাল শাড়ি পরে—তাও বেশির ভাগই নিমুদা দেয়। শুধু একটা ব্যাপারে মা খুব কড়া তা লক্ষ্য করেছে হারু—গয়না কখনও নেয় না। অনেকবার চেষ্টা করেছে নিমুদা দেবার। একবার তো একটা হার গড়িয়ে এনেছিল, ভাল দামী হার —মা তো নেয়ই নি, তুমুল কাণ্ড করেছিল তা নিয়ে। ফেরত না নেওয়া পর্যন্ত মা কথা কয় নি নিমুদার সঙ্গে। পরে সে হার পারুল-বৌদির গলায় দেখেছে হারু।

হারু যে দেখেছে, লক্ষ্য করেছে—করাই স্বাভাবিক—আজ এই যেন প্রথম মনে পড়ল নিমুর। সেও এক লহমায় স্মৃতির অতীত পাতাগুলো, ছোট-বড় ঘটনায় পাদচারণ ক'রে এল। অনেক জিনিস, বালকের মনের অনেক প্রতিক্রিয়ার ছায়া তার মুখের ওপর কি ছবি ফুটিয়েছে মনে পড়ে গেল।

অনেকদিন পরে অথবা এ-ই প্রথম হারুদের বাড়ির সামনে এসে তাই থমকে দাঁড়াল নিমু। তখনই ঢুকল না।

হারুর ঐ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া, তার ঐ চাপা ধিক্কার তাকে একটু চিন্তিত করেছে।

হারুর অস্তিত্ব নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায় নি। তার কথাটা ভেবে দেখে নি। অথচ দেখা উচিত ছিল।

শুধু কি নিমুর মা আর দিদির দুর্ব্যবহারে ক্ষোভ এটা, অপমানের জ্বালা? হারুর মনেও কি দীর্ঘদিনে তিক্ততা ও ধিক্কার জাগে নি!

আশ্চর্য।

এতদিনেও হারু কি ভাবছে কি মনে করছে—সেটা ভেবে দেখার কথা মনে হয় নি নিমুর। সে বোকা এবং ছেলেমানুষ এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তাকে মদত দেবার লোকের যে অভাব নেই, ওর বয়সও যে ইতিমধ্যে অনেক হয়ে গেছে—সাবালকত্ব অনেক জ্ঞান নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে—এটাও জানা উচিত ছিল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে হারুদের বাড়ির মধ্যে ঢুকল। এবার এই আসাটা কমিয়ে দিতে হবে, অন্ততঃ অনিয়মিত করা দরকার।

কিন্তু হয়ে উঠবে কি?

দৈহিক আকর্ষণ যেটুকু বা ছিল—সে গিয়ে এখন অন্তরঙ্গতার এমন একটা শান্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে, এ-ই এখন একটিমাত্র লোক দাঁড়িয়েছে তার—যার কাছে মনের কথা বলে শান্তি, যার সঙ্গে শুধু দুটো কথা কয়েই সুখ।

এই সুখ শান্তি ছাড়লে সে থাকবে কি নিয়ে?

॥ ৭ ॥

অনেক দেরি ক'রেই বাড়ি ফিরল হারু।

না, ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। পাড়ায় রাস্তায় বা স্টেশনে—কোথাও ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই। সে অনেকটা চক্কর দিয়ে বরাটদের পুকুরের অন্ধকার ভাঙা ঘাটটাতে গিয়ে বসেছিল। ভেবেছিল নিমুদার বাড়ি ফেরার সময় পার ক'রে তবে সে বাড়ি যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতক্ষণ বসা গেল না। প্রচণ্ড মশা

ওখানটায়। প্যাণ্ট ভেদ করতে পারে না ওদের হুল--কিন্তু যেটুকু বেরিয়ে আছে তা ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলল। শার্টের কাপড়ে শুঁড় গলানো ওদের কাছে কিছু নয়। তাছাড়া এই ফতুয়ার মতো শার্ট, হাতের অনেকখানিই তো বেরিয়ে থাকে। হাত কেন—মুখ, গলা, পা—ওদের কামড়াবার মতো খোলা গা তো অনেক।

মশা ছাড়াও আছে। খিদেও অসহ্য। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে খিদেটা বুঝি একেবারেই মরে গেছে, কিন্তু থেকে থেকে আবার এইসা মোচড় দিচ্ছে যে, মাথা খারাপ হবার যোগাড়। খিদের যে এত যন্ত্রণা তা কে জানত! ঐ যে বুড়ী ভিখিরীটা আসে রাতদুপুরে—'খিদেয় মোলাম বাবা, পেরানটা বাঁচাও যাহোক এঁটোকাঁটা দিয়ে' বলে চেঁচায়, তার দুঃখটা আজ বুঝল হারু।

শেষ অবধি, কোনমতে ঘণ্টাখানেক অবিরাম মশা চাপড়ে উঠে পড়তেই হ'ল। আবার তেমনি অনেক চক্কর দিয়ে—আঁদাড়-পাঁদাড় পেরিয়ে পাড়ায় এসে ঢুকল। এদিক ওদিক দেখে—কেউ নেই এদিকে, এ বাড়িতে কেউ নজর রাখে নি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে—একসময় বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

বিরক্তভাবে এবং অনিচ্ছাতেই ঢুকেছিল।

সে বিরক্তি আরও বেড়ে গেল আশার ব্যাপারে।

ওঃ, যেন ওৎ পেতে বসে ছিল এতক্ষণ। ছিনেজোঁক বটে একখানি! বর এসে গেছে তবু ভয়ডর নেই।

বোধহয় কপাটের ফুটো দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল, হারু কাছে আসতেই কপাটটা নিঃশব্দে খুলে দিলে। তারপর ভেতরে এলে হাতের মধ্যে একটা টাকা গুঁজে দিতে দিতে ফিস ফিস ক'রে বললে, 'সবাই ঘুমোলে বাইরে আসিস একবার, আমি এখানেই থাকব। কথা আছে।'

আবারও সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল হারুর। মাথায় খুন চড়ে গেল যেন। এক হ্যাঁচ্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিল, টাকাটা যে মাটিতে পড়ে গেল

তা লক্ষ্যও করল না, অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, 'গলায় দড়ি জোটে না! নির্ঘিন্নে কোথাকার!'

তারপর এক লাফ দিয়ে রকে উঠে ঘরে ঢুকে পড়ল।

যেন কোন শ্বাপদ জন্তু তাকে তাড়া করেছে—এই রকম একটা মনের ভাব তার।

সত্যিই ও মেয়েছেলেটাকে বিশ্বাস নেই, ও সব পারে। বাঘিনীর বাড়া।...

ঘরে ঢুকতে মেজাজটা অপেক্ষাকৃত একটু হালকা বোধ হ'ল। নিমুদা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আজ এখনই। বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে নিত্যকার অভ্যাসমতো মা পান সাজতে বসেছে। সাজা শেষ হয়েও এসেছে। খিলিটা হাতে পেলেই নিমুদা রওনা দেবে।

এ সময় হারু ঘরে থাকে না সাধারণতঃ, আজকাল অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফেরে। এদেরও সেটাই সুবিধে বলে কেউ কিছু বলে না। দৈবাৎ কোনদিন এসে গেলেও বাইরে দাঁড়িয়ে আশাদের সঙ্গে খানিক গল্প ক'রে সাড়া দিয়ে তবে ঘরে আসে। রাখালবাবু আজকাল মন্দিরে বসে সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটান। তিনিও ফেরেন রাত সাড়ে দশটায়। আজ এই দমকা হাওয়ার মতো সজোরে দোর খুলে ঘরে ঢোকাটায় একটু অবাক হ'ল দুজনেই।

অবশ্য, অবাক হ'লেও অপ্রতিভ হ'ল না। অপ্রতিভ হবার মতো ঘনিষ্ঠতা আজকাল আর নেই। দৈহিক সান্নিধ্যের প্রয়োজন থাকে না। অকারণে চায়ের কাপ ধরার নাম ক'রে স্পর্শসুখ অনুভব করা অতীতের স্মৃতিতে দাঁড়িয়েছে।

তা ছাড়া আজ তো যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছে নিমু।

বরং মনে হ'ল আজ ওকে এ সময়ে দেখে খুশীই হ'ল ওরা।

মা পান হাতে এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বললে, 'কোথায় ছিলি রে? এসে আবার বেড়াতে গিছলি, আশার মুখে শুনলুম।

আমি তাড়াতাড়ি খানিকটা সুজি তৈরী করলুম—খেয়ে যাস নি, এসে খাবি বলে।'

তারপর পান আর বোঁটাসুদ্ধ চুন নিমুর হাতে দিতে দিতে বললে, 'খুব একটা বড় সুখবর আছে রে। তোর বাবা কোথায় গেল, ওঁর কাছ থেকে সন্দেশ আদায় করতে হবে।...তোর নিমুদা তোর জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছে।...হয় কি, আজকাল আর এভাবে হবার জো নেই। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে নিমুদাকে এর জন্যে। অনেক কাণ্ড ক'রে ইউনিয়নকে বলে-কয়ে—বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে। এখন অবিশ্যি তুমাস টেম্পোরারী। তবে এইভাবে ছাড়া আর চাকরি পাবার উপায় নেই। তুমাস পরে বসিয়ে দেবে। আবার হয়তো পনেরো দিন পরে ঢুকে চার মাস—এইভাবে ছেড়ে ছেড়ে করার পর—কী যেন বলে, লীভ ভেকান্সী না কি—এক সময় পারমানেন্ট হয়ে যাবে। সোমবার তৈরী থাকিস, নিমুদা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।'

হঠাৎ যেন চোখের সামনে সব লাল দেখে হারু। চড়াৎ ক'রে গরম রক্ত চড়ে যায় মাথায়। মনে হয় এক-এক ঘুষিতে এদের হাসিমুখ তুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এই বাড়িটায় আগুন জ্বেলে সবাইকে পুড়িয়ে মারে। এদের, আশাদের—সেই সঙ্গে নিজেকেও—

মুখ গোঁজ ক'রে বলে, 'ও চাকরি করব না।'

'সে কি রে! বলে এ-ই তাই কত লোক ঘুষ খাওয়াতে চায়, কত সাধ্যি সাধনা করে। করবি নি কি? এর চেয়ে ভাল চাকরি কে দেবে শুনি? কটা পাস করেছিস, কী দরের ছেলে তুই যে, ধরে নিয়ে গিয়ে লাট সাহেবের চাকরি দেবে তোকে? এই কি পাবি নাকি নিজে চেষ্টা করলে? নিমুদা ছিল তাই—'

'পাই না পাই, কেউ দিক না দিক—নিমুদার দেওয়া চাকরি আমি করব না। ব্যস। সাফ কথা।'

বলতে বলতেই আবার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে হারু।

তরতর ক'রে সরু সিঁড়িটা বেয়ে ওদের সংকীর্ণ উঠোনে নেমে আসে। সদর দরজার পাশে তখনও আশার দরুন নোটটা পড়ে আছে। একবার ভাবল হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নেয়, তা হ'লে অন্ততঃ জলখাবারটা হয়ে যাবে—কিন্তু শেষ অবধি ইচ্ছে হ'ল না। আশা দেখতে পেলে মনে মনে টিটকিরি মারবে, তাছাড়া ঐ করতে দেরি হ'লে মা হয়ত ছুটে এসে হাত ধরবে। আবার ঐ সব প্রসঙ্গ, কথা-কাটাকাটি জবাবদিহি। থাক, দরকার নেই ওর খেয়ে।

দরজাটা তাড়াতাড়ি সজোরে খুলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কপাটটা ঘুরে আবার দড়াম ক'রে বন্ধ হয়ে গেল—কিন্তু সে হনহন ক'রে হাঁটছে—বাড়ি থেকে যত দূরে যাওয়া যায় এই তার চিন্তা—আওয়াজটা কানে গেলেও মাথায় গেল না তাই।

স্টেশনের ধারে গণেশের দোকানের পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল অবু। হারু ওকে দেখতে পায় নি, কোনদিকে অত লক্ষ্যও ছিল না তার, বন্ধুদের হাতে পড়তে হবে আর পড়লে নিগ্রহের সীমা থাকবে না জেনেও মরীয়ার মতো সোজা স্টেশনেই যাচ্ছিল। অবু সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকেই হাত বাড়িয়ে খপ ক'রে কাঁধটা ধরে কাছে টেনে নিল। তার পর ও চমকে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই হিস হিস ক'রে বলে উঠল, 'এই শোন! একটা মওকা এসেছে জোর। আর ইউ এ স্পোর্ট? রাজী আছিস দলে ভিড়তে? কিছু রোজগার হয়ে যাবে ছাখ!'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলই বলতে হবে। যা ভয় হয়েছিল!

কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়ালো।

অবুকে ওরা ভাল ছেলে বলেই জানত। সে এদের অর্থাৎ ফুচুন-নন্তুদের দলে নেই। ওদের দল একটু উঁচু ধরনের বলেই হারু বরং এড়িয়ে চলে। ওরা কিছু কিছু পড়াশোনা করে, মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরেজী ছবি দেখে। অবু টিউশানীও করে গোটা-দুই।

'কী কাজটা শুনি? কি করতে হবে আর করলেই বা কি পাওয়া যাবে?' তেমনি চাপা গলায় প্রশ্ন করে হারু।

'থাম, লাফাস নি অত এখন থেকে। কিছু হবে বলেই তো খাটতে যাচ্ছি। কিন্তু তুই যে চুকলি খাবি না তার বিশ্বাস কি?'

'যে দিব্যি গালতে বলবি তাই গালছি। তোদের এ দলে যাই না যাই, কাজ করি বা না করি—চুকলি খাব না কিছুতেই।'

'যাঃ, তোকে বিশ্বাস করলুম। আর এ কাজে থাকলে—নিজের দায়েই তোকে চুপ ক'রে থাকতে হবে। নইলে শালা মরবি তুইও।'

কথাটা খুলেই বলল অবু, চুপি চুপি, দ্রুত।

রেলের ইলেক্‌ট্রিক তার যারা চুরি করে তাদের এক দলের সঙ্গে অবুর জানাশুনো হয়েছে। কালোয়ার বটে, তবে ভারী ভদ্দরলোক তারা—এক জবানের মানুষ। কিছু কিছু উপকারও পেয়েছে তাদের কাছ থেকে।

ওদের ওপর নাকি এখন পুলিশ ভারী উৎপাত করছে। না, ধরপাকড় নয়, ঘুষ নিয়েই জুলুম। তারা কিছু বলবে না, দেখেও চুপ ক'রে থাকবে—এরই জন্যে ঘুষ। কিন্তু পেতে পেতে এখন তাদের খাঁই এত বেড়ে গেছে যে, এদের আর কিছু থাকছে না, রোজগারটা প্রায় সবই ধরে দিতে হচ্ছে রেল পুলিশের ঐ চার বেটা কনস্টেবল্‌কে।

তাই ওরা চায়—সাপও মরুক লাঠিও না ভাঙে।

এক দল ছেলে, ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে, যেন পুলিশের এই কাণ্ড ধরিয়ে দিতেই ওৎ পেতে ছিল—এই ভাবটা দেখাতে হবে। এরা যখন তার চুরি করতে যায়, ওরা চারজন কাছাকাছিই থাকে, অনেক সময় সাহায্যও করে কিছু। ঠিক সেই সময়টায় যদি এরা হৈ হৈ ক'রে গিয়ে পড়ে, শোরগোল তুলে যেন পুলিশের কুকীর্তিই ধরিয়ে দিতে এসেছে এইভাবে—ওদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে পাড়ার ভদ্রলোকদের ডেকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয় তাহলেই এদের ছুটি। ওদের থানায় দিতে হ'লে তাঁরাই দেবেন।

অন্য শাস্তিও তাঁরাই দিতে পারবেন দরকার হ'লে—এদের অত করতে হবে না। থানাপুলিশ ক'রে কাজ নেই, কি করতে কি বেরিয়ে যাবে—বরং গোলমালে একে একে সরে পড়বে। পাড়ার ছেলেদের তাতে আপত্তি হবে না, বাহাতুরিটা কে না চায়! এ কাজ ক'রে দিলে পুরো হাজার টাকা ধরে দেবে কালোয়াররা।

'এ কাজ তো তু-একজনের দ্বারা হয় না', অবু বলে, 'জন-দশেক হ'লেই ভাল হয়, নিদেন জনা-আষ্টেক। আমি চার-পাঁচজন যোগাড় করেছি, তোর বন্ধু ফুচুন আছে আরও তু' তিনজন দরকার। তুই থাকবি? দল বেঁধে কাজ, আর এ তো চুরি-ডাকাতি নয়, আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা তো যাচ্ছি হিরোর মতো। আমাদের দেখলে ওরা আগাম পাঁচশো টাকা দেবে। আর জীপে ক'রে সেখানে নিয়ে যাবে, মানে কাছাকাছি। আমাদের গিয়ে একটু আগে থাকতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতে হবে। এখনই—এই এগারোটা নাগাদ রওনা হ'তে হবে, নইলে সময়ে পৌঁছনো যাবে না। তার কাটতে যাবে তুটো-আড়াইটে নাগাদ, পুলিশকে বলা আছে। ফিরতে যার নাম ভোর। ত্থাখ্‌ যাবি? ইয়েস অর নো?'

'শ'খানেক পাবো তো—টাকা?'

'আশা তো রাখি, নইলে এত কাণ্ড করতে যাচ্ছি কেন?' 'তবে আমাদের অন্য কোন রিস্‌ক্‌ তো নেই, পাঁচশো তো আগেই পেয়ে যাচ্ছি। পঞ্চাশ-ষাট তো আগাম হাতে পেয়ে যাবি।'

তু'তিন মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল হারু। মাথাটা একটু একটু যেন ঘুরছে।

'কি রে, কি ভাবছিস?' অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞেস করে অবু।

'আমি রাজী।'

'চ তাহলে, ওরা ওই কালভার্টের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।'

অবু ওর একটা হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যেই লাইন দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

॥ ৮ ॥

হারু কতকটা মরীয়া হয়েই স্টেশনে উঠে এল। বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। বিরক্তি নিজের ওপরই। বিরক্তি মা বাবা, ঐ নিমুদাটা —সকলেরই ওপর—কিন্তু নিজের ওপর সব চেয়ে বেশী। নিজের কাপুরুষতার ওপর। খারাপ কাজ যে ক'রে সে-ই পালিয়ে বেড়ায়, ও করে নি, করতে পারে নি বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! এর চেয়ে বুদ্ধুমি আর কি আছে!

ওঃ, আজ সকালে যে কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছে! না, মুখ তো মায়েরই দেখেছিল, যেমন রোজ দেখে। আসলে বাবা, বাবাই এর জন্যে দায়ী। বাবার ঐ ছড়া-বাঁধা গালাগালে ঘুম ভেঙেছিল বলেই এত কষ্ট তার। পেটে কুকুরে ডন মারছে। সেই বেলা এগারটার পর এককাপ চা ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়ে নি। অথচ খাবার সাজানোই ছিল। সন্ধ্যাতেও, এখনও। নিজের আহাম্মুকিতেই এই বৃথা কষ্টটা পাচ্ছে—স্রেফ অকারণে।

আহাম্মুকি ছাড়া কি! ঐ বন্ধুগুলো, 'হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে' — মা কি সাধ ক'রে বলে—ঐ বেটাদের জন্যেই তো এই উড়ো উৎপাতে পড়তে হ'ল! সিগারেট আর সিনেমার পয়সা জুটছে না, কাজেই চুরি ধর্! তাই বা কেন বাবা মা দাদা দিদি—এদের ঘাড় ভেঙে সিগারেট সিনেমা দুই-ই হয়। ইদানীং যে শুরু হয়েছে রাজা-নেশা—ঢুকুঢুকু. তাইতেই আর কোন পয়সা তল পাচ্ছে না, কিছুতেই কুলোচ্ছে না। কুলোচ্ছে না নিজেরা চুরি ছ্যাঁচড়ামি ক'রেও তাই এখন ওকে ধরে টানাটানি।

পয়সা অনেক লাগে যে। কালী মার্কা বোতল কিনতেও পয়সা লাগে—তার ওপর বাবুদের আবার তাতে সানায় না। উঁচু দরের মাল চাই! সরস্বতী পূজো, কালী পূজো ছিল—এখন তো সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজো, কার্তিক পূজো, ইতু পূজো, অন্নপূর্ণা পূজো—মায়

সর্বজনীন শিবরাত্রি পর্যন্ত ধরেছে, টাকাও যে কিছু মন্দ ওঠে তা-ও না—কিন্তু যখন হাতে টাকা থাকে তখন তো এর পরে কি হবে তা মনে থাকে না—দেদার খরচ করেন বাবুসায়েবরা। ফলে আবার যে-কে সেই!

তা সে মরুক গে—তোরা যা করবার তোরা কর, যা ভাল বুঝিস। ওকে এর মধ্যে টানা কেন! সে তো তোদের ও-কাজে থাকে না, তবে! একদিন একটু খেয়ে দেখেছে—কি বিশ্রী বিকট বিস্বাদ! আর কি দুর্গন্ধ! সে গন্ধ ঢাকতে এলাচ খাবে—তারই কি দাম কম? সে কে দেবে? হাতে পায়ে ধরে হাজুকে বলে তার ভগ্নিপতির দোকান থেকে ধারে ছোট এলাচ কিনে খায়। তাতেও হয় না—পান সিগারেট—শেষে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে তবে শান্তি। সব মিশিয়ে ঐ গন্ধটা অনেক ঢাকা পড়ে গেছল। মা যে পাশে শোয়, টের পেলে দু'খানা ক'রে কেটে ফেলবে!

সেই থেকে ও লাইনকে নমস্কার করেছে হারু। ওর দৌড় সিগারেট পর্যন্ত। সে জন্যে ভাড়াটেদের আশা বৌদি আছে। তবু ওকে ধরেও হতভাগাগুলো কেন যে টানাটানি করে! আর কিছু পেলে না তো 'কল চুরি কর্'! যে কল দেখানো হ'ল—সে বাড়িতে কুকুর আছে, রাস্তায় পাহারাদার আছে। পাঁচিল টপকে নামতে হয়। অত সাহস তার হয় নি—পষ্ট কথা। পাবে তো ছ-সাত গণ্ডা পয়সা—নয়া পয়সা চল্লিশটা বড় জোর—তার জন্যে এতটা ঝুঁকি নিতে রাজী নয় সে। অথচ ওদের গ্যাজগ্যাজানি টিটকিরিও অসহ্য, সেই জন্যেই আর কিছু না পেরে রাত দুটোর সময় উঠে নিজেদের কলই খুলে পাঁচিল টপকে গিয়ে যথা-নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এসেছিল।

এ সবই ঠিক ঠিক সুশৃঙ্খলে হয়ে গিছল, কেউই কিছু টের পেত না—ঐ সময়কার পুরনো সমস্ত কলেরই চেহারা এক—সব মাটি হয়ে গেল বাবার জন্যে। সেই কবেকার পুরানো পেতলের কল—গেছে না আপদ গেছে। আড়াই টাকা দিয়ে প্ল্যাস্টিকের নতুন কল

এনে লাগাবে, ল্যাঠা চুকে যাবে—তা নয়, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভোর থেকে ওর বন্ধুদের গালাগাল শুরু করলে—সেকেলে বুড়িদের মতো ছড়া কেটে, হিসেব ক'রে ক'রে। সেই তার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এর পর ফুচুন-নন্তুদের হাতে পড়লে কী দুর্দশা হবে তা তো আর জানতে বাকী নেই। তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কোনমতে তাই ক'খানা রুটি মুখে পুরেই (রেশনের চালে কুলোয় না সব দিন—হপ্তায় অন্তত দুদিন দু'বেলা রুটি খেতে হয়) বেরিয়ে পড়েছিল, পুরো চার ঘণ্টা প্রায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, তার পর লেকের বেঞ্চিতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল, বোধহয় আধঘণ্টা-টাক্—সেই যা বিশ্রাম। তার পর থেকে আবার চলছে পায়ের ওপর দিয়ে। বাড়ি গিছল—সেখান থেকেও ঐ আশা বৌদির জ্বালাতনেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল—না খেয়েই। পয়সা দেয় যেমন দরকার পড়লে, তেমনি অন্যদিকে বড় জুলুম, তিন গুণ পুষিয়ে নেয়। বিরক্ত ধরে গেছে ওর।···মা তখন পূজোয়, উঠে তবে খাবার করবে। অতক্ষণ অপেক্ষা করা চলে নি।

তাও কি আর এমন বেরোয় না মানুষ! সে-ও তো এমন কতদিন বেরিয়ে পড়েছে। কেন যে মরতে নিমুদাদের বাড়ি ঢুকতে গেল! নিমুদা ওদের বাড়ি রোজ আসে—সেটা ওদের পছন্দ নয়। তা সে তোদের মামলা, হারু তার কি করবে? মেরে তাড়াবে ভদ্দরলোকের ছেলেকে—যাকে আট-ন' বছর বয়েস থেকে দেখছে! এখনও তো উপকার কম করে না।

আর ওরা 'যাও' বলবেই বা কেন, কেউ কাউকে খামোকা তাড়াতে পারে! তোরা আটকে রাখতে পারিস না তোদের বাড়ির লোককে!

মাঝখান থেকে হারুর ওপর যত ঝাল, এমন যাচ্ছেতাই করলে সবাই মিলে, এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সব বললে—মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল ওর, মনে হ'ল ঐ সব ক'টাকে খুন ক'রে ফেলতে পারলে তবে শান্তি হয়।

তবু তো তখনই বাড়ি ফেরে নি। সেই পাড়ার বাইরে বাঁশ-বনের মধ্যে বরাটদের ভাঙা পুকুরপাড়ে কতক্ষণ বসে বসে মশা তাড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও যে মাথা এত গরম হয়ে ছিল—তা কে জানত। বাড়িতে আসতেই বিশ্রী কাণ্ডটা হয়ে গেল।

এই বাজারে—ওর মতো থার্ড-ডিভিশনে ইস্কুল ফাইন্যাল পাস ছেলে—তা-ও তপনদের দৌলতে টুকে পাস করা, পাঁচ টাকা চাঁদার বদলে ক'দিনই ঢিলে বাঁধা সুতোর সঙ্গে দেশলাইয়ের খোলে উত্তর লিখে যুগিয়েছে তাই। টুকতে গেলেও যেটুকু বিদ্যে লাগে তা-ও ওদের ছিল না বলেই থার্ড ডিভিশনে গেছে। তা এই বিদ্যেতে কে চাকরি দিত ওকে? নিমুদা ওর মায়ের কান্নাকাটিতেই বহুকষ্টে ইউনিয়নের পাণ্ডাদের হাতে-পায়ে ধরে এই কাজটা যোগাড় করেছিল—অবশ্য দু' মাস চার মাস ক'রে কাজ এখন, ছাড়া ছাড়া অপরের ছুটির বদলি—তা হোক, এইভাবেই ঢুকতে হয় আজকাল—একথা সে অনেকের মুখেই শুনেছে। হাজুর দাদা নেপালও এইভাবে ঢুকেছে, আজ সে অফিসার। লেখা-পড়ার জোর থাকে পরীক্ষায় পাস ক'রে আই-এ-এস হও না -- কে বারণ করেছে! আর কাজ পাকা হবার জন্যে কি ওকে ভাবতে হ'ত, সে যা করবার নিমুদাই করত। কী যে হ'ল ওর, নিমুদাকে অপমান ক'রে, ও-চাকরি করব না, বলে বেরিয়ে এল—বাড়া ভাত ফেলে।

ছোঃ! কী আহাম্মুকি করেছে! চাকরি অবিশ্যি নিমুদা কিছু এই রাতদুপুরেই বাতিল ক'রে দেয় নি—কিন্তু অত কথা বলে আসার পর আবার কোন্ লজ্জায় ঘাট হয়েছে বলতে যাবে তাকে? আর বলবেই বা কাকে? ওদের বাড়ি যেতে পারবে না, মরে গেলেও না। ঐ রাস্কেলদের সামনে দিয়ে গিয়ে মাথা হেঁট ক'রে নিমুঁদাকে জানাতে পারবে না যে, তার অন্যায় হয়েছে।

এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে হয় বটে, কাল সকালে। তখন যদি একটু ইয়ে—মাপ চেয়ে নিয়ে বলা যায়—

ইস ! ভাবতে গেলেই যেন কী রকম লাগে—তার আগে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু সে তো সেই কাল সকালে। আটটা আটাশের ট্রেনে বেরোয় নিমুদা। কোনদিন আটটা সাতচল্লিশ। তার আগে অনেকখানি সময় সামনে। পেটে খিদে, হাতে একটিও পয়সা নেই। দোকানপাট বন্ধ হয়ে আসছে।

অবুটা ধরেছিল মধ্যে। সে শালা আবার তার-কাটাদের দলে গিয়ে পড়েছে। ওকেও টানবার তালে ছিল--পুলিশ জ্বালাতন করছে, তাদের জব্দ করা দরকার—তার জন্যে এখনই হাতে পঞ্চাশ-ষাটটা টাকা দিতে চেয়েছিল। প্রথমটা লোভে পড়ে রাজীও হয়েছিল হারু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। পুলিশকে জব্দ করতে গিয়ে যদি পুলিশই জব্দ ক'রে দেয়! জেল-হাজতে মারধোর—ভাবতেই মাথা ঝিমঝিম করে।

আসলে ও ভীতু, বিষম ভীতু। নইলে পরের বাড়ি চুরি করতে পারে নি—এই জন্যে বন্ধুরা টিটকিরি দেবে, হেনস্তা করবে সেই ভয়ে সে পালিয়েই বা বেড়াতে যাবে কেন, আর এইভাবে—চোরের মতো পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে এই গেরো বাধিয়েই বা বসবে কেন। শরীর ঝিমঝিম করছে, পা টলছে—ওদিকে বাড়া ভাত পড়ে—যাচা চাকরি।

নাঃ, সে যেমন আহাম্মুক তার এমনি নাকাল হওয়াই উচিত।

সেই কারণেই—মাথা ঘুরছে, শরীর নেতিয়ে আসছে বলেই—অবুর পাল্লা থেকে কোনমতে ছুটে বেরিয়ে—মরীয়া হয়েই স্টেশনে এসেছে। খেতে না পাক—একটু কোথাও বসতে হবে তাকে। তা নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে হয়ত। আর বসতে গেলে স্টেশন ছাড়া

জায়গা কোথা ? বেঞ্চি পাতা আছে, তোফা হাওয়া—যতক্ষণ খুশী বসে থাকো কেউ কিছু বলবে না।

এখন তো বাঁচুক আগে—ফুচুন-নন্তু যদি এত রাত্রেও ওৎ পেতে বসে থাকে তো থাক। এসে ধরে—সেও যা মুখে আসে শুনিয়ে দেবে। ওদের নেশার খরচা যোগাতে সে চুরি করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। সাফ কথা তার। ওরা আর কী করবে, মধ্যে মধ্যে ভিক্ষের মতো একটা-আধটা সিগারেট খাওয়ায় কি একটু-আধটু চা। না-ই খাওয়াল। ওতেই তো তার সব দুঃখ ঘুচবে না। নিত্যকার ভার তো আর কেউ নিচ্ছে না। এত কি গরজ ওর ঐ হতভাগাদের মন যোগাবার !

সত্যি কথা বলবে, তাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় দুঃখ নেই।

অবশ্য না-ও দেখা হ'তে পারে। কোনমতে ঘণ্টা দুই কাটাতে পারলে পাঁচিল টপকে আবার বাড়িতেই ফিরবে। আশা বৌদির একটা টাকা রাগ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেটা আগে খুঁজে নেবে তারপর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়বে। খাবার ঢাকা আছে—কিন্তু না, আজই গিয়ে খেতে বসলে নাক ফুলিয়ে হাসবে মা। এতক্ষণ যেভাবে কেটে গেল আর ছ-সাত ঘণ্টাও কাটবে। রাত্রে খায় নি দেখলে মার মনটাও নরম হবে, খোশামোদ ক'রে খাওয়াবে সকালে। সে বাইরে থাকলে মা ছিটকিনিটা এমন ক'রে রাখে—টুক ক'রে দরজা খুলে আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়বে, জামা প্যাণ্ট ছেড়ে—

॥ ৯ ॥

এই ধরনের চিন্তা—কতকটা দিবাস্বপ্নের মতোই তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সেই ঘোরের মধ্যেই এসে কংক্রীটের বেঞ্চিটায় বসেছে হারু। পাশে যে কেউ বসে আছে তা অত লক্ষ্য করে নি। কিছুক্ষণ পরে একটা ফোঁসফোঁস শব্দে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

এখন মনে হ'ল শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে, কিন্তু কানে গেলেও মনে পৌঁছয় নি ; নিজের সম্বন্ধে জরুরী চিন্তা ভেদ ক'রে মাথায় ঢোকে নি। এইবার, একটু একটু ক'রে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে শব্দের চেহারাটাও চিনতে পারল।

ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদছে কে! একা বসে কাঁদলে—নিঃশব্দে কাঁদবার যে সামান্য শব্দটুকু হয়—সেইটুকুই শব্দই হচ্ছে। আসলে সেই জন্যেই এতক্ষণ সেটা তার কানে যায় নি ভাল ক'রে।

স্টেশনে সার সার আলো জ্বললেও সেখানটায় একটু অন্ধকার মতোই ছিল—হারু যেখানটায় বসেছে। সত্যি কথা বলতে কি বেছে বেছে সেখানটায় একটু অন্ধকার মতো দেখেই বসেছে। ফলে ফিরে চেয়েও চিনতে একটু দেরি হ'ল, প্রায় এক মিনিট সময় লাগল। বিশেষ লোকটা হারুর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, বোধহয় ও ঠিক চিনতে পেরেছে হারুকে, কান্নার বেগটা সঙ্গে সঙ্গে সামলাতে পারে নি বলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তবু, একটুখানি চেয়ে থেকেই চিনতে পারল। আকৃতিতে, পাকা চুলে, পোশাকে।

মাধব লাহা। মাধবদাদু ওদের।

বেচারী মাধবদাদু!

চিনতে পারবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দটাই প্রথম মনে এল হারুর—'বেচারী!'

হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে যে এই লোকটা তার চেয়েও দুঃখী।

তার তো সারা জীবন পড়ে আছে সামনে, আশা অফুরন্ত—ঐ লোকটার জীবন ফুরিয়ে এসেছে, আশা নেই ভবিষ্যৎ বলতেই কিছু নেই। যা আছে, যেদিন বাঁচছে, সেই বর্তমান জীবনটুকুই তার। তাতে দুঃখের লাঞ্ছনার সীমা নেই।

অথচ কী না ছিল! সুখী হবার জন্যে যা যা দরকার—অন্তত ওদের সাধারণ লোকের যা মনে হয়—স্ত্রী-পুত্র ছেলে-মেয়ে ঘর বাড়ি পয়সা—সবই ছিল। কী টাকাটাই না রোজগার করেছে!

ওর পেটেও বিদ্যে ছিল না এক ফোঁটা—অদৃষ্টের জোরে আর বুদ্ধির জোরে টাকা লুটেছে লোকটা। অথচ এখন কিছুই নেই। খোয়া যায় নি, রেস খেলে কি মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয় নি, স্রেফ স্বেচ্ছায় 'অন্যের বিনানুরোধে' পরকে ধরে দিয়েছে। দিয়ে এখন এই ভিখিরীর অধম জীবন কাটাচ্ছে।

এই—বোধহয় আশি বছর বয়েস, কি এক-আধ বছর বেশিই হবে—পনেরো-ষোল বছর থেকে খাটছে রোজগার করছে—চুয়াত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত চালিয়ে গেছে খাটনি—এখন কোথায় একটু আরাম করবে, তোয়াজে থাকবে—না এই দুর্দশা! ওঃ, কী বরাত রে! বরাতের খেল বটে একখানা!

এত রাতে অন্ধকারের মধ্যে মাধবদাদুকে একা বসে কাঁদতে দেখে আশ্চর্য এক সান্ত্বনা পেল হারু। যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে ডাকল, 'দাদু!'

মাধববাবু সাড়া দিলেন না। মনে হ'ল পুরনো হাতকাটা পাঞ্জাবির খুঁটটা দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছে কান্নার চিহ্নটা লোপ করার চেষ্টা করছেন। সেই জন্যেই সাড়া দিতে পারছেন না।

হারু আবার ডাকল, 'মাধবদাদু!' এবার ভারী বিকৃত গলায় উত্তর এল, 'কী?'

খুব ঠাণ্ডা আওয়াজে আন্তরিকতার সুরে হারু প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে দাদু? কারও সঙ্গে রাগারাগি ক'রে এসেছেন? কানাই কাকা—?'

'চুপ কর্!' একটা চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন মাধববাবু, 'ছেলে-মানুষ ছেলেমানুষের মতো থাক্। এসব কথায় তোর দরকার কি? খুব মজা, না? এখুনি ইয়ার-বক্সীদের কাছে ফলাও ক'রে বলে বেড়াতে ভারী সুখ! পাড়ায় পাড়ায় এই নিয়ে হাসি মস্করা পড়ে যাবে, তোদের চারটে হাত বেরোবে তাতে!'

রাগ হবারই কথা। কিন্তু বোধহয় নিজের শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত বলে হারু রাগ করল না, বরং আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে বলল,

'মাইরি বলছি দাদু, তা নয়। আপনার দিব্যি বলছি। আর, পাড়ার কারও কি জানতে বাকী আছে বলুন যে নতুন ক'রে বলে বেড়াব!'

তবু মাধববাবু খিঁচিয়ে ওঠেন, 'তবে আবার ঢং ক'রে জিজ্ঞেস করছিস কেন, য়্যাঁ?···জেনেশুনে ন্যাকামি!'

'না, মানে এখনই নতুন কিছু হ'ল কি না—' এই বলে চুপ ক'রে যায় হারু। রাগ হয় না তার, বরং একটু দুঃখই হয়। ভয়ও হয় কেমন এক রকমের। বুড়ো হ'লেই এমনি খেঁকী হয়ে যায় নাকি সবাই? না কি দুঃখকষ্টে পড়েই এই রকম হয়েছে?·· বুড়ো বয়েসে কি তারও এইরকম হবে, যদি এতদিন বাঁচে? ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি দূর-ছাই করবে, পাগল নাচাবে?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এইসব ভাবছিল, হঠাৎ যে আবার মাধব-বাবুর মতি একেবারে এমন বদলে যাবে তা ভাবে নি; আর কতটুকু সময়ই বা—দু'তিন মিনিটের বেশিও তো হবে না—কাজেই একটু যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠল ওঁর এই কাণ্ডটায়।

মাধববাবু এদিকে ফিরে আচমকা ওর দুটো হাত চেপে ধরেছেন, 'কিছু মনে করিস নি ভাই। দিনরাত জ্বলেপুড়ে মাথার ঠিক নেই আর।'

একে তো চমকে উঠেছে—একটু যেন ভয় পাবার মতো ক'রেই—তাতে এই হঠাৎ মিষ্টি কথা—অবাক হয়ে সেই অন্ধকারেই চেয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে।

'হ্যাঁরে নাতি, রাগ করিস নি তো ভাই? সবই তো জানিস—মাথার ঠিক কি থাকে? না থাকতে পারে?'

এতক্ষণে সামলে নিয়েছে হারু, হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁরই একখানা হাত মুঠো করার মতো ক'রে ধরল সে, বলল, 'না না, কী বলছেন! ছিঃ! মনে করার কি আছে!'

মাধববাবু অবশ্য বেশীক্ষণ সৌজন্যের অভিনয় করতে পারলেন না, একটু ব্যগ্রভাবেই নিজের স্বার্থের কথাটা বলে ফেললেন, 'একটা কাজ করবি ভাই? আমার একটা উপকার?'

'কী বলুন না!' এর আর এত ক'রে বলার কি আছে। করার মতো হ'লে নিশ্চয়ই করব।'

'তোদের তো প্রকাণ্ড দল আছে—ছোঁড়াদের? আমার ঐ পাঁঠাগুলো—ঐ যে যারা আমার ছেলে বলে বিষয়-সম্পত্তি সব দখল ক'রে বসে আছে—সব ক'টাকে ধরে ঠেঙাতে পারিস বেধড়ক? বেশ ক'রে—হাত-পা ভেঙে দিবি একেবারে, যাতে ছ-মাস শয্যাগত হয়ে থাকে? পারবি?'

এবার আর হাসি চাপতে পারল না হারু। ভাগ্যিস তেমন আলো নেই, বুড়োও চোখে তেমন দেখতে পায় না—নইলে জ্বলে যেত নিশ্চয়।

হাসি সামলে কথা কইতে দেরি হবে বৈকি। তার মধ্যেই ব্যস্ত ও ব্যগ্র মাধববাবু বলে উঠলেন, 'কী হ'ল, কথা কইছিস না যে?'

একটু হাসতে পেরে মনটা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে হারুর —ফলে দুষ্টুবুদ্ধিও জেগেছে একটু। বললে, 'কত ছাড়তে পারবেন?'

'ছাড়তে পারব?' মাধববাবু চমকে উঠলেন, 'তার মানে?'

'টাকা! টাকা কত বার করতে পারবেন সেই কথা বলছি।... আপনি তো বেশ লোক। এসব কাজ কি মাগনা হয়? এতে যেমন ঝঞ্ঝাট তেমনি ঝুঁকি। থানাপুলিশ হ'তে পারে। হবেও। পাড়ার ছেলে, চেনা লোক, পুলিশের খুঁজে বার করতেও দেরি হবে না।'

মাধববাবু কেমন যেন থতিয়ে যান। বলেন, 'সে কত টাকা ভাই? বেশী তো নেই। টাকা থাকলে কি আর ঐ আঁটকুড়ির বেটা হারামজাদারা এমন করতে পারত!...যদি অল্পে-স্বল্পে হয়—'

'তা ধরুন চার-পাঁচ শো টাকা তো বটেই। ক'জন লোক দরকার হবে সেই হিসেবে। মাথাপিছু একশো টাকার কম কেউ রাজী হবে না।'

'পাগল! অত কোথায় পাব?' নিমেষে রুক্ষ হয়ে ওঠে মাধববাবুর কণ্ঠ, 'সেদিন আর আছে? শেষ যা ছিল গতবার

বাড়ি মেরামতে বেরিয়ে গেল। দশ কুড়ি টাকা হয়ত বাক্স হাতড়ে বেরোবে। অত কথা কি, এক'শোটা টাকাও যদি ঠেঙে থাকত কলাবাজারের গুণ্ডা ধরে আনতুম, তোদের খোশামোদ করব কেন?'

'না দাদু। দশ-বিশ টাকার জন্যে মরতে যাবো আপনার ঐ ঘি-তেল-খাওয়া পুরুষ্টু ছেলেদের! থানাপুলিশ বাদই দিন –মারতে গেলে মার খেতেও তো হবে কিছু কিছু, তেমন পাওনা না হ'লে এ কাজে কেউ আসবে না। আর আজকাল চার-পাঁচশো টাকার দাম কী?'

মাধববাবু বেজার মুখে বলেন, 'তোরা সবাই সমান। বুড়োদের দেখতে পারিস না। ওরে, তোরাও বুড়ো হবি একদিন, এ তেজ থাকবে না। দাঁত পড়বে চুলও পাকবে। ছেলেমেয়ে তোদেরও হবে, তারাও বেইমানি করবে—'

গরগর করতে করতে উঠে যান মাধববাবু।

অস্ফুটকণ্ঠে আরও কি বলতে বলতে যান।

বোধহয় গালাগালিই দেয় হারুকে, হারুর দলবলকে।

॥ ১০ ॥

আস্তে আস্তে বাড়ির দিকেই রওনা হন মাধববাবু। পাড়াটা এক, কিন্তু রাস্তাটা এক নয়। হারুদের গলি ছাড়িয়ে দুটো গলি পার হ'লে তবে ওঁদের বাড়ি। বড় বাড়ি, চার কাঠা জমির ওপর তেতলা বাড়ি। এ রাস্তায় তেতলা ওঠার কথা নয়—কর্পোরেশনের লোককে উদাসীন রেখে কাজ সেরেছেন মাধববাবু। অশ্বত্থামার শিবকে খুশী ক'রে পাণ্ডব শিবিরে ঢোকার মতো। অশ্বত্থামার পূজোয় খুশী হয়ে শিব নিষ্ক্রিয় রইলেন মাত্র, তাতেই অশ্বত্থামার কাজ হাসিল হয়ে গেল। উপমাটা মাধববাবুরই। এককালে নিজে বলে জিভে ও টাক্‌রার একটা বিচিত্র আওয়াজ ক'রে হাসতেন।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ান একটু।

দোর খোলাই আছে, তাঁর জন্যে নয়। বড় নাতি রাত বারোটায় বাড়ি ফেরে, সে নাকি নেতা হয়েছে। নাকি রাজনীতি ক'রে বেড়ায়। মাধববাবুর কাঁচা বয়স ফিরে এলে এই পেশাই ধরতেন। ছোকরার এলেম আছে।

তা নয়, কড়া নাড়তে হবে না, কাউকে ডাকাডাকিও করতে হবে না। সে সব কিছু না। এ দ্বিধা অন্য কারণে। বেরোবার আগে বার বার প্রতিজ্ঞা ক'রে গিছলেন, বেশ সরবেই করেছিলেন যে, আর কখনও এ বাড়ি ঢুকবেন না, এদের মুখ দেখবেন না। যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাবেন, না হয় ভিক্ষে ক'রে খাবেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিক্ষে করছে দেখলে অনেকেই দয়া করবে। বৃন্দাবনে মাধুকরীর রেওয়াজ আছে, না হয় বৃন্দাবনেই চলে যাবেন। সেখানে—শুনেছেন—নাম বিক্রী ক'রেও পয়সা পাওয়া যায়। মাড়োয়ারীরা দেয় পয়সা। দু-তিন ঘণ্টা ভগবানের নাম করলে সকালে 'সিধে' বিকেলে নগদ পয়সা দেয়। তাই করবেন, মন্দ কি! ·

রাগের মাথায় প্রতিজ্ঞা করা এক জিনিস, বাস্তবে তা পালন করা অন্য। কত কঠিন এসব কাজ রাগের সময় মনে থাকে না। সেইটেই ভাবছিলেন এতক্ষণ বসে বসে, নিজের অসহায় অবস্থা ভেবেই আরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। চিরদিন কর্মঠ মানুষ তিনি—আজ একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে গেছেন। আজকাল আগের মতো হাঁটাচলা করতে পারেন না, প্রায়ই মাথা ঘোরে। দু-তিন দিন রাস্তায় পড়েও গেছেন। মাঝে মাঝে সব কেমন ভুল হয়ে যায়। তা নইলে তো এখানে বসেই পয়সা রোজগার করতে পারতেন। পয়সা কোথা দিয়ে আসে, আসতে পারে—তার ঘাঁৎ-ঘোঁৎ তো সব জানাই আছে। এ বেটাদের মতো নয়, চাকরি ছাড়া— চাকরির নামে যতটা সম্ভব অলস ভাবে বসে থাকা, এই তো চাকরি হয়েছে আজকাল—আর কিছুই বোঝে না। অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে

বসে থাকা। কিসে আর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়বে তার জন্যই যত কোশিস, চেঁচামেচি। বরাত ফেরানো যায়। ভাগ্য, অন্ততঃ অর্থভাগ্য মানুষের মুঠোর মধ্যে—এ সোজা কথাটা হারামজাদারা বোঝে না।

তা নয়, ঘোরাঘুরি আর সম্ভব নয়। এমনিও, এই দেহে ভিক্ষে করতে করতে কোথায় যাবেন? পথে যদি মাথা ঘুরে মুখ-থুবড়ে পড়েন? যদি কথা হরে যায়, পক্ষাঘাত হয়? কেউ চিনবেও না, কেউ জানবেও না—ভাল রকম একটা সৎকার পর্যন্ত হবে না হয়ত। শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। আর, বৃন্দাবনে গিয়ে যে থাকবেন—বলে তো ফেললেন খুব সহজে—মাধুকরী করা মানেও তো ঘোরা—যতদূর শুনেছেন। বৃন্দাবনে যান নি কখনও, কোথাওই যান নি, কাশী গয়াও না। শুধু শুধু পয়সা খরচ। বলেছিল অনেকে, মা-বাপের গয়া ক'রে এসো না কেন, কিসের জন্যে করবেন তিনি? তাঁরা ছেলের জন্যে কি ক'রে গিছলেন, পরের দয়ার ওপর বরাত দিয়ে ফেলে গিছলেন, রাস্তার ভিখিরী ক'রে। জন্মদান তো তাঁদের গরজে, মানুষ করলে ঋণ জন্মায় মা-বাপের কাছে, ওঁর কোন ঋণই নেই। বেড়াতে যাবেন? কলকাতার মতো শহর তো বলে সারা ভারতেই নেই, তাহলে আর অন্য জায়গায় যাবেন কেন? তীর্থ? ভগবানের নাম করলে বাড়িতে বসেই ঢের পুণ্য হয়—মহাপুরুষেরাই বার বার বলে গেছেন।

হ্যাঁ, যতদূর শুনেছেন, মাধুকরী মানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'জয় রাধে' বলে দাঁড়ানো, মানে ভিক্ষে চাওয়া—ভিক্ষে বলেই কেউ আধখানা কেউ সিকিখানা রুটি দেয়। কোন ঠাকুরবাড়িতে চাইলে বড়জোর একটু ডাল কি একটু তরকারী দেবে। তাও একাদশীতে মাধুকরী হয় না—সেদিন নাকি প্রসাদ পায় ভাঙ্গীতে আর ধোবিতে। তার মানে হয় উপোস, নয় তো বাসি রুটি জমিয়ে রেখে জলে ভিজিয়ে তাই গেলা—নুন দিয়ে। এত কষ্ট কি সহ্য হবে? এই দেহ নিয়ে ঘুরবেনই বা কি ক'রে?

এক নাম বিক্রী। তাও, তিন-চার ঘণ্টা 'হরেকেষ্ট' 'হরেকেষ্ট' ক'রে চেঁচাতেও তো দম লাগে। মাথা ঘুরবে যে! তা ছাড়া অজানা অচেনা দেশ—গিয়ে আস্তানা খুঁজে থিতু হ'তে ব্যাপারটা বুঝতেই তো ঢের সময় লাগবে। লোকের সঙ্গে চেনা পরিচয় হ'লে না হয় একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু সে সময়টা চালাবেন কিসে?

এইসব ভেবেছেন আর মশা তাড়িয়েছেন। ফেলা থুথু চেটে, মুখে চূণকালি মেখে আবার এই বাড়িতে এসেই ঢুকতে হবে—সেই ভেবেই তখন কান্না পেয়ে গিছল। এতক্ষণ মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরই বাড়ি তাঁরই ঘর, তাঁরই সাজানো সংসার—সে কথা তো কোন বেটাবেটি অস্বীকার করতে পারবে না—ঢুকবেনই বা না কেন?...তবু মনে যেন জোর পাচ্ছেন না, নিজের কাছেই অপমান আর লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঢুকতেই হ'ল। দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। কড়া ধরেই দরজা ঠেললেন আর তাতেই লক্ষ্য হ'ল—কড়াটা নড়নড় করছে,—আল্‌গা হয়ে গেছে। বদলানো কি সারানো দরকার—নইলে এ কড়ায় তালা লাগানোও যা, না লাগানোও তাই।

সেই সঙ্গে আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল (রাস্তায় আলোর পোস্টটাও—কর্পোরেশনের লোকদের কিঞ্চিৎ 'পান' খাইয়ে নিজের দোরের সামনে উল্‌টো দিকে বসিয়েছেন, চোখে পড়ার কোন অসুবিধে নেই) দরজার গোবরাটের পাশে কে এক চোক্‌লা পলেস্তারা খসিয়েছে। এ নোনা লেগে খসা নয়—নোনা লাগার জো নেই তাঁর বাড়িতে, নিজে গিয়ে মগরা থেকে বালি এনেছেন, রাণাঘাটের ইট। মিস্ত্রিরা তা নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে, তিনি কারও কথায় কান দেন নি। ও বেটাদের আর কি, কোনমতে যা-তা

দিয়ে কাজ বুঝিয়ে পয়সা নিয়ে পালাতে পারলেই হ'ল—তার পর মর্ বেটা তুই। জিস্‌কা জায়েগা উস্‌কা জায়েগা, ধোবিকা কেয়া —সেই যে বলে না, এও তাই। তিনি জানেন এ অঞ্চলের মাটিতে বা বালিতে বিষম নুন, নোনা ইট কি বালি নিলে পুরুষানুক্রমে ভুগতে হবে।

এ চোক্‌লা খসানো পাড়ার ছেলেদের কাজ। এইখানে এই গলিতে, ওঁদের রকে বিশেষ ক'রে—যত মাঝারি বয়েসের ছেলেদের আড্ডা। কাজ নেই, কম্ম নেই, পরের খোলা রক পেল কি বসে গেল—দিনরাত কেবল ধোঁয়া ওড়ানো আর যত রাজ্যের টকীর গল্প। আড়াল থেকে শুনেছেন উনি। যত রাজ্যের নটীদের নামধাম জপমালা। বাবুদের আবার আজকাল বিড়িতে শানায় না, সিগারেট চাই। বসে বসে নোংরা করবে, ছাই আর চিনেবাদামের খোসায় ভরিয়ে রেখে যাবে। এক-এক বেটা আবার রকে বসেই 'হাক্-থু' ক'রে থুথু ফেলে। কিছু বলবার জো নেই, তারা তো ফোঁস করবেনই—বাড়ির এঁরাও। 'কেন ওদের ঘাঁটাতে যাও, শেষে পাগল ক'রে ছাড়বে তখন ভাল হবে?' এই হ'ল তাদের যুক্তি।

কী দেশই হ'ল, কী কালই এল! মন্দকে মন্দ বলার উপায় নেই। কেউ তোমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়ালেও একটা কথা বলা চলবে না।···হাত্তোর সংসার! মার্ ঝাড়ু সংসারের মুখে।

এ ঐ বেটাদেরই কাজ। তিনি হলপ ক'রে বলতে পারেন। এক ঢঙ হয়েছে বাবুদের কোমরে ছুরি গোঁজা। সেই ছুরি দিয়েই বসে বসে এই কম্ম করেছে, ইচ্ছে ক'রে। বুড়োর একটু অনিষ্ট ক'রে মজা দেখব বলেই।···গ্রিল আর কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট দিয়ে রকটা বন্ধ করতে পারলে আড্ডাটা ভাঙে, কিন্তু সে আর কে করছে! তাঁর হাতে কিছু 'এথি' থাকত, তিনি পয়সা খরচ করতে পারতেন তো হ'ত। এ বাবুদের কারুরই এসব চিন্তা নেই, হেজে যাক মজে যাক—দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যেতে পারলেই হ'ল কোনরকমে।

ইস! এই মজবুত প্ল্যাস্টারিং—এমনি ক'রে গর্ত করেছে! ওদিকে চান আর মাথা গরম হয়ে যায় মাধববাবুর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এসব কাজ করিয়েছেন তিনি, কোন বেটার ফাঁকি দেবার পথ রাখেন নি। বালি বিলিতি-মাটির ভাগ নিজের মতে মিশিয়েছেন, ওদের কথা শোনেন নি। বেশী মাটি দিলে জমে তাড়াতাড়ি কিন্তু তেমনি ফাটেও খুব। তাঁর কাছে এসব চালাকি চলবে না। এখন ওই যে গর্তটি হ'ল, এরপর থেকে এক-একটা ছেলে আসবে আর আঙুল দিয়ে কিম্বা ছুরি দিয়ে কুর কুর ক'রে একটু একটু খসাবে, এইটেই হবে খেলা। দেখতে দেখতে এতখানি জায়গার বালি খসে ইট বেরিয়ে পড়বে।

অসহ্য রাগ হয়ে উঠল তাঁর। মনে হ'ল বেটাদের সামনে পান তো খুন ক'রে ফেলেন যারা এ কাজ করেছে। তাতে ফাঁসি যেতে হয়—সেও ভি আচ্ছা। তবু তো ধরার পাপ কিছু কমিয়ে যেতে পারবেন।

এই একটা রোগ আজকাল তাঁর হয়েছে। একটুতেই রেগে ওঠেন আর রাগলে জ্ঞান থাকে না—খুন চড়ে যায় মাথার মধ্যে। ফলে একটু পরেই মাথা ঘুরতে থাকে, সেই সঙ্গে এমন বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয় যে কারও সঙ্গে কথা বলা কি এক পা চলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। হাত-পা কাঁপতে থাকে থরথর ক'রে। এইটুকু রাগেই বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু হয়েছে।

আস্তে আস্তে সামলে নেন নিজেকে। শরীর খারাপ হয়ে এখানে পড়ে থাকলে কেউ খোঁজও নেবে না। আর এ কার ওপরই বা রাগ করছেন তিনি? কেনই বা? বাড়ি কার? তাঁর তো আর কিছুই নয়। যাদের বাড়ি তারা পারে রাখবে না পারে খোয়াবে। তিনিই বা আর ক'দিন? চিরদিন দেখবেন এমন মৌরসীপাট্টা নিয়ে তো আসেন নি। এ তো এখন যাকে জাঁকড়ে থাকা বলে তাই আছেন। আর কে-ই বা তাঁর আছে, কার জন্যেই বা ভাববেন? তাঁর কেউ নেই এ সংসারে, বেশ বুঝে

নিয়েছেন। বেটা? বেটা নয় ওরা পাঁঠা। ওরা কি মানুষ? মানুষ হ'লে ছেলে বলে পরিচয় দিতেন। ওদের মঙ্গলের কথা ভাবতেন।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে অভ্যাস বশতঃই আস্তে আস্তে আবার ভেজিয়ে দেন। তারপর অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে ওপরে ওঠেন। সবটা ঘুটঘুটে করছে অন্ধকারে। রাস্তার আলো ওপরের দিকে এসে পড়ে, উঁচু পাঁচিলের জন্যে উঠানে আসে না। সিঁড়িতে তো আসবেই না, পুবদিকের অংশটা আড়াল হয়। আলো ছিল। এদিকের বারান্দায় একশো বাতির আলো ছিল একটা। শেষ যে আসত—নেতা নাতি, সে-ই নিভিয়ে দিত। সিঁড়িতে একটা জিরো পাওয়ার বাল্‌ব ছিল, সারারাত জ্বলত। সে দুটো বাল্‌বই খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়, জ্বলে না। কিংবা সুইচেই কোন গোলমাল হয়েছে। কে বা দেখছে! ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ—বারান্দা আর সিঁড়ি কার ভাগে পড়েছে সেটাই ঐ পাঁঠাগুলো এখনও ঠিক করতে পারে নি—কার এ দুটো বাল্‌ব্ কিনে লাগানো দরকার। ফলে কেউ-ই কেনে না—এ ওকে ঠেলে, ও একে। ভাগের মা গঙ্গা পায় না সেই যে বলে না, এও তাই। উনি কিনে দিলে হয়ত দয়া ক'রে কেউ লাগাত। ওঁর আমলে তো এসব বালাই ছিল না, উনি একেবারে পোলক স্ট্রীট থেকে গ্রোস দরে বাল্‌ব্ কিনে আনতেন। ছেলেরা কত বিলিয়েছে তখন বন্ধুবান্ধবদের—ওঁকে লুকিয়ে। এখন নিজেদের একটা জোটে না।

॥ ১১ ॥

অন্ধকারেই চাবি খুলে নিজের ঘরে ঢোকেন মাধববাবু। তারপর তেমনি দেওয়াল হাৎড়ে সুইচ টেপেন। এ চাবি কাউকে দেন না, কাউকেই বিশ্বাস নেই আর। চিরদিনের জন্যে যাচ্ছি

ব'লে বেরোলেও চাবি নিতে ভুল হয় নি। এ ঘর তো তার একার নয়, সেও তো আছে। চাবি হাতছাড়া হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। সে যেদিন ফিরে আসবে, ঘরে ঢুকতে পারবে না। দেখবে মালপত্র সব নয়-ছয় ক'রে কোন্ হারামজাদা দখল ক'রে বসে আছে।

আলো জ্বেলে দোর ভেজালেন। খাবার বাইরে কোথাও ঢাকা আছে বোধহয়। হয়ত বেড়ালে খেয়েছে নয় তো একপাল আর্শোলা ঢুকে বসে আছে। ও খাবার আর খেতে পারবেন না তিনি। দরকারও নেই। একবেলা না খেলে মানুষ মরে না।

জামাটা খুলে আলনায় রাখতে গিয়ে সামনের দেওয়ালে নিজের ছবিটার উপর নজর পড়ল। যৌবন কালের ছবি। তখন কী স্বাস্থ্যই ছিল, কী চেহারা! সবাই ভাবে চিরদিনই বুঝি এমনি হাড়গোড় ভাঙা দ ছিলেন তিনি। ছবিটা জোর ক'রে তুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর এক বন্ধু। খরচ নেয় নি। পরে গিন্নী বড় করিয়ে বাঁধিয়ে এনে টাঙিয়েছে।

সত্যি, ও চেহারা যেন মনেই পড়ে না।

তখন কতই বা বয়েস হবে? পঁচিশ? ছাব্বিশ?—না আর একটু বেশী? কে জানে? অত হিসেব আর করতে পারেন না।

সে অনেক দিনের কথা।

অনেক, অনেকদিন বাঁচলেন তিনি।

কবে পৃথিবীতে এসেছেন হিসেবেই আসে না। কত কাণ্ডই দেখলেন। বড়লাট কার্জন এসে বাংলা ভাগ করলে, তখন তো তিনি রীতিমতো বড় হয়ে গেছেন, বার্ডসাই তামাক খেতে শিখেছেন দাদার চাকরদের কাছ থেকে।

হ্যাঁ—থাকার মধ্যে পৃথিবীতে ঐ দাদাই ছিল এক। আপন নয় মামাতো ভাই। মা বাবা দুজনেই চলে গিছলেন, তখন মাধববাবুর ছ-সাত বছর বয়েস। কাকারা ছিল, তাদেরও

তেমনি অবস্থা। তাছাড়া তারা আগেই ভিন্ন হয়েছে। একেবারেই কেউ দেখার নেই, প্রতিবেশীরা এসে তুলে দিয়ে গিয়েছিল হাটখোলার অমর পালের বাড়ি। মামাতো ভাই, তাও আপন নয়, মার জ্যাঠতুতো দাদার ছেলে।

অমর পাল মানুষটা ভাল ছিলেন। অন্য লোক হ'লে এ সম্পর্কে ঘাড় পাততেন না। কিন্তু অমরবাবু বলেছিলেন, 'বেশ তো, থাকুক। এতগুলো লোক প্রতিপালিত হচ্ছে আমার এখানে, ওকে আর পুষতে পারব না!'

না, নেহাৎ আশ্রিত অনাথার মতোও রাখেন নি। চাকর-বাকরদের 'কাকাবাবু' বলতে শিখিয়েছিলেন, দোতলায় একটা ঘর নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন—আলাদা। সরকার মশাই—প্রাণবল্লভ দত্ত, মহা ঘুঘু লোক—বলেছিল, 'কেন; আমার এতবড় ঘর পড়ে আছে, দেদার জায়গা, এখানেই থাক না! একটু নজরও রাখতে পারব 'খন।'

কিন্তু সেজদা—অমরবাবু তাতে মত দেন নি। বলেছিলেন, 'না দত্তমশাই, হাজার হোক আত্মীয়, রক্তের ছিটে আছে, সেটা খারাপ দেখায়। আর ঘর যেকালে আছে—থাক্ না আলাদা ঘরে।' সেজদা বোধহয় মতলবটা বুঝেছিলেন, তামাক সাজাতে শিখিয়ে মুহুর্মুহু তামাক সাজাবে।

আশ্রয় বা কাপড়-জামা-জুতোর ব্যবস্থা ক'রেই ক্ষান্ত হন নি সেজদা, ইস্কুলেও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল না, এক মেয়ে—তার অনেকদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তখন—তারই এক ছেলে অর্থাৎ নাতিকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। তার জন্যে বাড়িতে মাস্টার আসত, তাকেও বলে দিয়েছিলেন, 'এ ছোঁড়াটাকেও একটু দেখো দিকি মাস্টার—মধ্যে মধ্যে। আমি বরং দুটো টাকা ধরে দোব তার জন্যে।'

এত সত্ত্বেও লেখাপড়া হয় নি মাধববাবুর। সেদিকে ঝোঁক ছিল না বললে ভুল বলা হয়—বিষম অরুচি ছিল। যে সামান্য বাংলা লেখাপড়া ছোটবেলায় শিখেছিলেন, এখানে তার ওপর দুটো-চারটে ইংরেজী শব্দ ছাড়া আর কিছুই শেখা হয় নি।

আসলে নজরটাই ছিল তাঁর নিচু। সেটা আজ বুঝতে পারেন। সেজদা তাঁকে একটু পৃথক ক'রে উঁচু ক'রে দেখাবার চেষ্টা করলে কি হবে, তিনি ঐ দাসী চাকরদেরই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তাদের সঙ্গে আড্ডা ইয়ার্কি, ফষ্টিনষ্টি। অমরবাবুর নজর পড়লে এর জন্যে বকুনিও খেতে হয়েছে তাঁকে। বলেছেন, 'তুমি আমার ভাই এই পরিচয়ে রেখেছি, দোতলায় আমার ঘরের লাইনে আলাদা ঘর দিয়েছি, গাড়ি যায় ইস্কুলে পৌঁছে দিতে—তুমি যদি ওদের সঙ্গে আড্ডা দাও কি ইয়ার্কি করো—তাহলে তোমার মানটাই বা কোথায় থাকে, আমার মানটাই বা কোথায় এসে দাঁড়ায়! ছিঃ! ভদ্রলোকের ছেলে, সেইভাবে মানুষ হবার চেষ্টা করো না। না-ই বা রইল বাপ মা, সেভাবে অনাথার মতো ভিখিরীর মতো তো আর মানুষ হচ্ছো না। অনাথাশ্রমে তো নেই!'

এসব কথা সেদিন ভাল লাগে নি। বরং মনে মনে গজরে-ছিলেন। চাকর-বাকরদের কাছে বিষ উদ্গার করেছিলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে দাদার আচরণে বৈষম্য খুঁজে বার করেছিলেন। নিজের নাতির সঙ্গে আচরণে কি কি তফাৎ--জীবনযাত্রার কোন কোন উপকরণ যে ওঁর চেয়ে বেশী বা ভাল পায়—তার তালিকা তৈরী করেছিলেন। বরং যেন সেজদার ওপর টেক্কা দিতেই আরও বেশী ক'রে ঐ চাকর-বাকরদের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

ফল ভাল হয় নি। হবার কথাও নয়। লেখাপড়া যেটুকু হ'তে পারত তাও আর হয় নি—ঐসব নিরক্ষর নিত্যসঙ্গীদের সাহচর্যে জিনিসটাই অরুচিকর বোধ হয়েছে। দশ বছর বয়সেই তামাক খেতে শিখিয়েছিল রান্নাঘরের চাকর যত্ন। বাঁকুড়া জেলার

এক ঠাকুর ছিল মহেশ বলে, বছর ত্রিশ বয়স হবে—ষণ্ডামার্কা গোছের চেহারা ছিল, তাকে খুব ভাল লাগত মাধববাবুর। কেন তা জানেন না। মহেশ প্রায় সব রকম বদভ্যাসেই পটু হয়ে গিছল, প্রায় সব রকম নেশাতেই। কেবল মদটা খেত না ধরা পড়বার ভয়ে। মহেশ রাত্রে প্রায়ই লুকিয়ে তাঁর ঘরে আসত এবং নেশা ও বদভ্যাসে পাঠ দিত। লোকটা শুধু তার ঘরে শুতই না, এক-একদিন পা টিপিয়ে নিত।

লেখাপড়া যে আর হবে না ক্রমশ অমরবাবুও তা বুঝে নিলেন। বছর কয়েক দেখে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'রোজ সকাল বিকেল, কাছারি ঘরে গিয়ে বসবে, সেরেস্তায় কাজ শিখবে। একটু কিছু তো ক'রে খেতে হবে। লেখাপড়া শিখলে না যে চাকরির চেষ্টা দেখব। রেলির বাড়িব মুচ্ছুদ্দী দুবেলা এসে আড্ডা দেয় আমার এখানে—কিন্তু কিছুই শেখো নি কোন্ লজ্জায় কাজের কথা বলব? পয়সা থাকলে বলতুম ব্যবসা করো। আমি কিছু দিতে পারতুম যদি তোমার মতিগতি ভাল হ'ত। তোমাকে টাকা দেওয়া মানে জলে দেওয়া। বরং, কাছারি তো সকাল বিকেল—দুপুরবেলা একটু বড় বাজারে কি পোস্তায় যদি ঘুরতে পারো, আখেরে কাজে দেখবে।...ব্যবসাও শিখতে হয়—শুধু টাকা থাকলে কারবার হয় না। আর ঘাঁৎ-ঘোঁৎ যদি শিখে নিতে পারো—পয়সার জন্যে আটকাবে না। কারুরই আটকায় নি।'

একথাও পছন্দ হ'ল না। ষোল-সতেরো বছর বয়স তখন—মনেব দিক দিয়ে বা অভিজ্ঞতার কথা ধরলে পঁচিশ-ছাব্বিশ হয়ে গেছে। কিছুই জানতে বাকী নেই—এ বাড়ির ঝি এবং চাকরদের কৃপায়। মায় সইসের সঙ্গে বসে গাঁজাও টেনে দেখেছেন। এবার বাইরের বিশাল পৃথিবী ও স্বাধীন জীবনের জন্যে মন ছট্‌ফট করছে। নিজের মতো ক'রে থাকবেন, সংসার পাতবেন—এই ইচ্ছে।

বেরিয়েও পড়লেন একদিন দাদার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে। একেবারে যে অকারণে তা নয়। আজ আর অস্বীকার করবেন

না, নিজের কাছে মিছে বলে লাভ কি, একথা আর কাউকেই বলেন নি কোনদিন—স্ত্রীকে শুধু বলেছেন, তাও অনেক পরে—চুরিই করেছিলেন। দাদা মিথ্যে অপবাদ দেন নি কিছু। বাপের বয়সী দাদা, বাপের কাজই করেছেন, পথের অনাথা ছেলেকে কুড়িয়ে এনে রাজ-সমাদরে রেখেছিলেন; আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নি কোনদিন—তাঁরই শখের ঘড়িটা চুরি ক'রে সেই কৃতজ্ঞতার শোধ দিয়েছিলেন মাধববাবু।

ঘড়ির খুব শখ ছিল দাদার। নানা আকারের নানান রকম ঘড়ি ছিল ঘরে ঘরে। পাথুরেঘাটার মল্লিকবাড়িতেও অনেক ঘড়ি আছে, কিন্তু সেজদার কাছে কিছু নয়। এক বৈঠকখানা ঘরেই ছিল সাতাশটা। কাচের কেসে ক'রে ছোট-বড়-মাঝারি—নানা আকারের ঘড়ি। একসঙ্গে নানান রকম বাদ্য ক'রে বাজত সেগুলো, দাদার ভারী আমোদ হ'ত।

যেমন বড় ঘড়ি—তেমনি পকেট ঘড়িও ছিল অগুন্তি। তার মধ্যে রদারহাম না কি বলে তাদের বাড়ির ঘড়িই ছিল চারটে। খাঁটি সোনার ঘড়ি, সোনার চেন। তারই মধ্যে একটা—এক-ফাঁকে সরিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সহজে নজরে পড়বে না। দম দেবার লোকটি বহুদিনের, ভীমরতি মতো হয়ে গিয়েছিল—নেহাৎ তার কোন আশ্রয় ছিল না বলেই ছাড়ান নি সেজদা। সে অত হিসেব রাখতে পারত না। চোখেও দেখত না। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়েই মাধববাবু কাজটা করেছিলেন।

ধরাও পড়েছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দিন তিনেকের মধ্যে। একটা তথ্য মাধববাবুর জানা ছিল না যে, এই ঘড়িগুলোর ওপর অদ্ভুত মমতা ছিল অমরবাবুর। আজ এটা কাল ওটা ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো পঁরতেনই—মাঝে মাঝে অবসর পেলে এমনই নেড়ে চেড়ে হাত বুলিয়ে দেখতেন কোনটা কেমন চলছে, আগে চলছে কি পিছিয়ে পড়ছে—ঠিকমতো দম দেওয়া হচ্ছে কিনা।

সেজদা চেঁচামেচি করেন নি, চাকর-বাকর কাউকে সন্দেহ করেন নি, প্রশ্নও করেন নি—আশ্চর্য মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল তাঁর—একেবারেই মাধববাবুকে ডেকে বলেছেন, 'ঘড়িটা ঐখানেই রেখে যেয়ো, তাহলে আর কিছু বলব না। আমার সামনে ফেরত দিতে হবে না, তুমি লজ্জায় পড়ো কি অপমানিত হও তা আমি চাই না, তাতে অপমানটা আমারই বেশী। আমি এখন নিচে যাচ্ছি, আধঘণ্টা পরে ফিরব, তখন যেন দেখতে পাই।'

চেঁচামেচি মাধববাবুই করেছিলেন।

বড়লোকদের বাড়ি কোন আত্মীয় আশ্রিত হয়ে থাকলেই এই রকম ক্ষোয়ার হয় তার, এইটেই স্বাভাবিক ; আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল মাধববাবুর, মানে মানে সরে পড়া দরকার ছিল ; আসলে এবার অসহ্য হয়ে উঠেছে, বসে বসে ভুজ্যি ধ্বংস করছে হতভাগাটা—তা কি ক'রে আর তাড়ান তাই একটা মিথ্যে অপবাদ দেওয়া—আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসা। তিনি ও-ঘরের ধারে-কাছেও যান না কোনদিন, বাড়ি সুদ্ধ সবাই জানে। গরিব মানুষ, আশ্রিত—গরিবের মতোই থাকেন, মিছিমিছি তাঁর নামে এই অপবাদ দেওয়া! কেন, এতই যদি অসহ্য বোধ হয়েছিল—সোজাসুজি 'পথ ছ্যাখো' বললেই হ'ত। গরিব অনাথ, বাড়িতে পড়ে আছেন বলেই কি এত বড় দুর্নামটা দিতে হয়!

চিৎকার ক'রে বাড়ি সুদ্ধ লোক জড়ো ক'রে শাপশাপান্ত গালিগালাজ ক'রে ধর্ম দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদেকেটে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন তিনি। সবাইকে ডেকে বললেন, তাঁর ঘর কাপড়জামা বাক্স-প্যাঁটরা সব তল্লাশ ক'রে দেখতে, মায় ল্যাঙট পর্যন্ত খুলে ফেললেন সকলের সামনে।

তাঁর জোরও ছিল, এমন জায়গাতেই ঘড়িটা রেখেছিলেন তিনি যে, কারও বাবার ক্ষমতা ছিল না খুঁজে বার করে। আস্তাবল-বাড়ির উত্তরদিকের দেওয়ালে নোনা লেগে দু-এক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে, সেইখানেই একটা ইট আল্‌গা ক'রে তার

খাঁজে রেখে দিয়েছেন। যদি কখনও এইরকম অবস্থা হয়—জানাজানি হয়ে যায়—সকলের অজ্ঞাতে যাতে বাইরে থেকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন---সেইভাবেই রেখেছিলেন।

অমরবাবু নীরবে তামাক টানতে টানতে সব শুনলেন। তার পর ওঁর অভিনয় শেষ হ'তে ফরসিটা খানসামার হাতে দিয়ে মাধববাবুকে বললেন, 'এর পর আর তোমার এখানে থাকা চলে না। তোমার পক্ষেও উচিত নয়—এখন মতলববাজ বদমাইশ বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি থাকা। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলুম, তোমার যা যা নেবার—জিনিসপত্র, এমনকি বিছানাও, যা তুমি ব্যবহার করছ---সব নিয়ে যেতে পারো। দত্তমশাইকে বলে দিচ্ছি, দশটা নগদ টাকাও দিয়ে দেবেন। যে ক'দিন নিজে না রোজগার ক'রতে পারো---ওতেই চালিয়ে নিও। আমার এখানে আর কখনও এসো না, কোন কারণেও।'

এর পর ঐ ভিক্ষের দশটাকা না নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু অতখানি মান-অপমান বিচার করতে সাহস হয় নি মাধববাবুর। কাপড়জামার তোরঙ্গ, মায় তোশক চাদর বালিশও নিয়ে বেরিয়েছিলেন, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে। তবু নিজের কাছেই এটা চরম নির্লজ্জতা, নিঘিন্নেপনা মনে হয়েছিল বলেই—সাফাই গাওয়া হিসাবে তাঁর ভৃত্যবন্ধুদের শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলে এসেছিলেন, 'আমি কি এমনি নিচ্ছি? এ আমার হক্কের পাওনা। যারা রাখতে এসেছিল তারা কি দুটো চারটে জিনিসও দিয়ে যায় নি সেই সঙ্গে? তাছাড়া, এই যে ক'মাস কাছারিতে কাজ করলুম—তার দরুন মাইনে দিয়েছে এক পয়সাও?'

॥ ১২ ॥

যার জন্যে এত কাণ্ড সে ঘড়ি অবশ্য ভোগে লাগে নি। কোথায় দাঁড়াবেন সে চিন্তাটা তত বড় ছিল না—বীণা বলে সেজদার বাড়িতেই বছর পঁচিশ ত্রিশের একটি ঠিকে ঝি ছিল বাসনমাজার

—তখনকার মতো তার ঘরেই মালপত্র নিয়ে ওঠা গিয়েছিল। তার বর 'নিউদ্দিশ', মানুষ একজন ছিল, সেও অন্য লোক ধরেছে —সেজন্যে ঘর খালিই ছিল—কিন্তু ওঁকে বসিয়ে খাওয়াবে সে সঙ্গতি বা আয় কোনটাই ছিল না। সেই ঘড়ি বেচেই খেতে হয়েছে। অবশ্য পেয়েও ছিলেন ; তখনকার দিনেই ঐ ঘড়িতে প্রায় নব্বুই টাকার মতো পাওয়া গিয়েছিল।

তবে সে টাকা নিঃশেষ হবার আগেই চাকরিও একটা যোগাড় ক'রে ফেলেছিলেন মাধববাবু।

প্রাণপণেই ঘুরতে হয়েছিল বটে—এবং এই ঘোরবার সময়ই অমরবাবুর কথার যাথার্থ্যটা বুঝতে পেরেছিলেন: আর একটু অন্তত লেখাপড়া শেখা উচিত ছিল, নইলে কোন ভদ্র চাকরিই পাওয়া সম্ভব নয়—আর পৃথিবীটা যে এত কঠিন জায়গা, অন্নের চিন্তা যে এমন বিকট চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে পারে মানুষের সামনে —এ কথাটা এর আগে বোঝেন নি। বোঝার কোন হতুও ছিল না। সেজদার বাড়ি যে কি আরামে ছিলেন—সেটাও এখন মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাজ পেলেনও শেষ অবধি সেই অমরবাবুর সূত্র ধরেই, তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে। এবং সেই যে সামান্য ক'মাস ঘোর অনিচ্ছায় কাছারিঘরে গিয়ে বসতে হয়েছিল—সেই শিক্ষাটার জোরেই।

দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়িতে কাজ পেলেন একটা। মন্দির আর তার সঙ্গে সদাব্রত বা অতিথিশালা। নিত্য শ'খানেক লোক খাবার ব্যবস্থা। চোরবাগানের মল্লিকদের মতো অগুনতি নয়, দোর খোলাই আছে, যে যত পারো খাও—পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের মতো এখানেও টিকিট দিয়ে গোনা লোক খাওয়ানো। তা হোক, তারও খরচ ও ঝঞ্ঝাট তো কম নয়। আগে শুধু হিসেব রাখার জন্যেই কাজ পেয়েছিলেন—মাধববাবুই কৌশলে বাবুদের যথেষ্ট খোশামোদ ক'রে সরকারের কাজটাও ঐ সঙ্গে জুড়ে নিলেন।

চেহারাটা সুন্দর ছিল, স্বাস্থ্য ভাল—বাবুরা যে অনুগ্রহ করতে দ্বিধা করতেন—সেটা অন্তঃপুর থেকে আদায় হয়ে যেত।

প্রথম ঢুকলেন সাত টাকা মাইনেতে। তবে তা ছাড়াও ছিল। একটা ঘর আর দুবেলা প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা। তাতেই বেঁচে গেলেন মাধববাবু। বলতে গেলে রাজপ্রাসাদে রাজভোগের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসে বীণার ঐ বস্তির ঘরে বাস এবং তার হাতের সংক্ষিপ্ত কদর্য রান্না একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না। তার তুলনায় আবার রাজপ্রাসাদেই এসে পড়লেন মনে হ'ল।

তখনকার দিনে খাওয়া-থাকা বাদে সাত টাকা মাইনেই যথেষ্ট ছিল, বিশেষ একটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের। কিন্তু তাতে খুশী থাকবার মানুষ মাধববাবু নন।

তাঁর 'প্রতিভা'ও এবার নিজের পথ পেল বিকশিত হওয়ার।

দেদার চুরি করেছেন তিনি। বস্তুত তিনিই শুরু করলেন। এর আগেকার বুড়ো প্রাণকেষ্ট সরকারমশাই এত জানতেন না—চাল ডাল, নুন তেল, প্রসাদের মোণ্ডাটা-আসটা—এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। খাইখরচ লাগত না বলে টাকাও জমিয়েছিলেন মাইনে থেকে। মাধববাবু দেখলেন—চুরির চার দোর খোলা। সঙ্গে সঙ্গেই সে সব পথের সদ্ব্যবহার শুরু ক'রে দিলেন। মালে চুরি, মালের দামে চুরি, হিসেবে চুরি—গরিব লোকের পেট মেরে চুরি—কোন্‌টা বাদ ছিল! পাঁচ টাকা মণের আতপ চাল কিনে প্রথম পাঁচ টাকা চার আনা, পরে সাড়ে পাঁচ, ক্রমশ পাঁচ টাকা দশ আনা বারো আনা লিখতে লাগলেন। অসুবিধে নেই কিছু, যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক। যে বাজার করে সে-ই খরচ লেখে। ওধারে মহাজনের ঘরে দাম কমাতে লাগলেন সেই অনুপাতেই—চাপ দিয়ে দিয়ে। পাঁচ টাকার চালটা পৌনে পাঁচ, চার দশ এই দরে কেনা হ'তে লাগল। তার ফলে চালে কিছু ক্ষুদ মেশাচ্ছে কিনা দেখার দরকার নেই।

সদাব্রতর চাল কেনা হ'ত আগে সাড়ে তিন টাকা মণ, সেটা উনি আরও মোটা চাল পৌনে তিন টাকায় কিনে পৌনে চার লিখতে লাগলেন। এমনি সব জিনিসেই। তেল নুন মশলা ঘি ময়দা সব্‌জি। বাবুদের বাগান থেকে মধ্যে মধ্যেই ফল সব্‌জি আসত, কিন্তু সে তো আর কোথাও লেখাজোখা নেই, বাবুরা কি আর তার হিসাব রাখছেন? তবে মাধববাবু আখের বুঝে কাজ করতেন, মধ্যে মধ্যে এক-আধদিন বাজার খরচটা কমিয়ে লিখতেন। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন কেউ এ-প্রসঙ্গ তোলে—এই দিনগুলি দেখিয়ে বলবেন, এই এই দিনে বাবুদের বাড়ি থেকে এসেছে, তাই বাজার কম হয়েছে।

ফল ও মিষ্টিও এইভাবেই—কেনার সময় দাম ও ওজনে যত কমে খাতায় ততই সেটা বেড়ে যায়। পুরুতকে হাত ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁর পাওনায় হাত দিতেন না, বরং দেশে যাবার সময় কিছু কিছু মাল উপযাচক হয়ে দিয়ে দিতেন। সদাব্রতর তো কথাই নেই, বেওয়ারিশ বে-অভিভাবক ব্যাপার। একশো টিকিট কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ত্রিশ-চল্লিশে এসে ঠেকল, ওদিকে তাদের খাদ্যও হ'তে লাগল কদর্যতর, এখনকার খবরের কাগজের ভাষায়—'মনুষ্য-খাদ্যের অযোগ্য'।

বাবুরা কেউই কোনদিন আসতেন না, খবরও নিতেন না। ম্যানেজার মধ্যে মধ্যে নামকো-ওয়াস্তে আসতেন—মাধববাবুর যত্নে সমাদরে আর খাতা দেখার কথা তুলতেই পারতেন না। কোনদিন দুপুরে অতিথি ভোজনের সময় এসে পড়লে মাধববাবু আহারার্থীর সংখ্যার স্বল্পতার একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ দিয়ে দিতেন। ফলে এদিকেও যেমন আয় বৃদ্ধি হ'তে লাগল—ওদিকেও দুটো কাজ এক-সঙ্গে করছেন বলে মাইনের হারও বেড়ে গেল।

আয় বাড়তে সংসার পাতার ইচ্ছেও হ'ল একটু। সেদিকেও ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ঐ পাড়াতেই তাঁদের স্বজাতি একটি বিধবা থাকতেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে। জনশ্রুতি, তাঁর হাতে কিছু পয়সা আছে। মেয়েটি দেখতেও ভাল, তবে তখন তার মাত্র ন'-দশ বছর বয়েস। তা হোক, সামান্য এটুকু বয়সের তফাৎ তখন বিবাহে বাধা হ'ত না। এই সৌভাগ্যপক্ষীর ডিমে তা দেওয়ার কাজ শুরু করলেন মাধববাবু। মহিলা সন্ধ্যায় আরতি দেখতে বা কোন পালাপার্বণে ব্রত-উপবাসে দর্শন করতে এলে মাধববাবু খুব খাতির করতেন, 'আসুন মা, এদিকটায় এসে দাঁড়ান (কিম্বা বসুন), ভাল দর্শন হবে' বলে ভাল জায়গা বেছে দিতেন। জায়গা ভাল যে হ'তই সব সময়ে তার কোন মানে নেই, মনোযোগটাই ধর্তব্য। বিশেষ খাতির বা মনোযোগে সকলেই আকৃষ্ট এবং খুশী হন—মহিলাও হবেন, এতে আর আশ্চর্য কি! যাবার সময় ভাল ভাল প্রসাদ পাতায় মুড়ে সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের বাইরে এসে তাঁর হাতে দিতেন। সামনে দিলে অন্য লোককে দেবার প্রশ্ন উঠবে। ফল-মিষ্টি বা রাত্রের লুচি-দুধ-মিষ্টি-ভোগ পরিমাণে এত হ'ত না যে, সবাইকে বিলোনো যায়। বৈশাখ মাসে বৈকালীর একটা বিশেষ প্রসাদ পাওয়া যেত, কিন্তু সেও মাধববাবুর কল্যাণে সংক্ষিপ্ততম আয়োজনে এসে পেঁৗচেছে। তার ওপর পূজারীঠাকুরেরও একটি 'জলপাত্র' আছে এখানে, তাকে কিছু দিতে হয়, নইলে ঠাকুর-মশাইয়ের নিমীলিত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠবে, চুকলি খাবেন। ওঁকে চটালে চলবে না।

যাই হোক, এতেই মহিলা খুশী হয়ে উঠলেন। গোপনে, বিশেষ ক'রে তাঁর প্রতি এই মনোযোগ দেওয়াতেই বরং বেশী আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন। দিন কতক পরে মাধববাবু তাঁর বাড়িতেও যাওয়া শুরু করলেন। মহিলার বয়স বেশী নয়—তবে মাধববাবু ওকে 'মা' বলে ডাকেন, সুতরাং এ নিয়ে কোন মন্দ আলোচনার পথ রইল না।

তখন মা ডাকাটাকে কেউ কথার কথা ভাবত না, দার্শনিকভাবে গ্রহণ করত না।

কিছুদিন আসা-যাওয়ায় মহিলাও ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। একমাত্র মেয়ে তার, এমন একটি ফুটফুটে ছেলেকে জামাই করারই সাধ ছিল। সেকালে, ছেলে কতদূর কি লেখাপড়া করেছে কিম্বা কত রোজগার করে—এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না বিয়ে দেবার সময়। জাতকুল ঠিক থাকে, মাতালগেঁজেল না হয়—এইটুকুই দেখত। সেদিক দিয়ে মাধববাবু সুপাত্তর। একটু 'এদিক ওদিক' সেটা কেউ তত দোষ বলে ধরত না। বয়সের তফাৎ তো কিছুই না।

মাধববাবুর পঁচিশ ও লবঙ্গলতার দশ—তাতে বিয়ে আটকাল না। লবঙ্গর মামারা বা কাকারাও বিশেষ আপত্তি করলেন না কেউ। অমর পালের পিসতুতো ভাই—এতকাল দাঁয়েদের দেবোত্তর এস্টেটে চাকরি করছে, মাইনে বেড়ে কুড়ি টাকায় দাঁড়িয়েছে, এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে?

'কী দিতে থুতে হবে' এ প্রশ্নে মাধববাবু হাত জোড় করেছিলেন। সবিনয়ে বলেছিলেন, 'আপনিই তো আমার অভিভাবক মা, কি চাইতে হবে আপনিই বলে দিন। আমার তো দেখছেন, না চাল না চুলো, না কোন আত্মীয়—মানে মাথার ওপর দাঁড়ায় এমন লোক! রীতকিৎ যা করবার তাও আপনাকেই করাতে হবে, সংসার পেতে দেওয়ার দায়—সেও ধরুন আপনারই। আপনার টাকা নিয়ে আমি সিন্দুকজাত করতে চাই না। একটা ঘর ভাড়া করতে হবে, না না—আপনার এখানে আমি উঠব না, ঘরজামাই থাকা বড় ঘেন্নার কথা—বাক্স প্যাটরা বিছানা বাসন—কী কী দরকার সেইগুলো সব আপনি করিয়ে দিন, তাহলেই আমি নিশ্চিন্তি। আপনার মেয়ের সংসার আপনি পেতে গুছিয়ে দেবেন, ওর আমি কি জানি বলুন?'

তবু শাশুড়ি খুঁৎ খুঁৎ করছেন দেখে আবারও দুহাত জোড় করেছিলেন মাধববাবু, 'দেখুন, যদি কিছু দিতেই চান—এখন দেবেন না।

একটু কোথাও সস্তায় জমি কেনার ইচ্ছে আছে, মাথা গোঁজার মতো একটু জায়গা করা আর কি—সেই সময় যা হয় দেবেন, যা সুবিধে আপনার। জ্ঞান হয়ে ইস্তক পরের বাড়ি বাস—এ আর ভাল লাগে না।'

আরও খুশী হয়েছিলেন সবাই—জামাইয়ের বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। শাশুড়ি দুখানা হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ওঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা তুমি এখনই নিয়ে রাখো মাধু, সইসাবুদ সব করা আছে। যখন দরকার বুঝবে ভাঙিয়ে নিও। কে কখন ভোগা দিয়ে নিয়ে যাবে—কিম্বা আমিই হঠাৎ পটল তুলব —তুমি বঞ্চিত হবে।'

বুদ্ধিমান মাধববাবু আর আপত্তি করেন নি—'এসব কি বলছেন, ছিছি! আপনিই যদি না থাকেন তো আমার ঘর-বাড়িতেই বা দরকার কি!' বলতে বলতে সযত্নে ইদানীংকার নিত্য-সঙ্গী ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটাতে কাগজ দুখানি পুরেছিলেন।

অনেক খুঁজে মামাশ্বশুররা এই পাড়াতেই আট টাকায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে দিলেন। একটা ঘর আর সামনের রকে একটু রাঁধার জায়গা। খাট বিছানা আলনা তোরঙ্গ বাসনকোসনে ভাল ক'রেই ঘর সাজিয়ে দিলেন লবঙ্গর মা। মেয়ের কষ্ট হবে বলে মাসিক একটাকা মাইনেতে বাসনমাজার একটা ঠিকে ঝিও ঠিক ক'রে দিলেন, সে মাইনে তিনিই দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

বৌভাত ফুলশয্যা অবশ্য লবঙ্গর মার কাছেই হ'ল। তিনকুলে কেউ নেই ছেলের—আর কোথায় হবে? অমরবাবুকে নেমন্তন্ন করতে গিছলেন এঁরা, তিনি পায়ের বাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন। বিয়ের দিন শুধু সরকারকে দিয়ে একটা ধুতি আর একথালা মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আইবুড়োভাত হিসেবে, সেই সঙ্গেই বৌয়ের মুখ-দেখানি চারটে টাকা।

আলাদা ঘর ভাড়া করলেও মাধববাবুর ইচ্ছে ছিল—শাশুড়ি যদি আর একটু পেড়াপীড়ি করেন তো তাঁর কাছেই থেকে যাবেন

—একমাসের ঘর ভাড়া না হয় লোকসানই যাবে, তেমনি আরো অনেক মাসের, হয়ত বা ক'বছরেরই ভাড়া বেঁচে যাবে, সেটা মহালাভ। কিন্তু শাশুড়ির মেয়েই বেঁকে দাঁড়াল। মায়ের অতিরিক্ত জামাইপ্রীতিতে সে ক্রমশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিল, হয়ত সেদিক দিয়ে মাধববাবুর আচরণেও খুশী ছিল না। সে প্রবল আপত্তি তুলতে মাও আর বেশী পেড়াপীড়ি করলেন না। মাধববাবুও সেদিকে কোন কলকাঠি নাড়তে সাহস পেলেন না। লবঙ্গর সম্পর্কেই সম্পর্ক যখন—সে বেঁকে দাঁড়ালে কোন্ সুবাদে থাকবেন?

তবে পরে যখন জানা গেল, ও-বাড়ি লবঙ্গর মার জীবনস্বত্ব, তাঁর মৃত্যুর পর শ্বশুরের উইল অনুসারে তাঁর দেওরপোতে বর্তাবে এবং হাতেও এমন কিছু টাকা নেই, শ্বশুরের এস্টেট থেকে যা মাসোহারা পান সেইটেই ভরসা, তাঁর মৃত্যুতেই সে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে; এবং লবঙ্গর বিয়ের জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তারও সবটা শাশুড়ি খরচ করেন নি বা মেয়েকে দেন নি—তখন মনে মনে লবঙ্গকে ধন্যবাদই দিয়েছেন। বরং বিয়ের সময়ই চাপ দিয়ে আর কিছু বার ক'রে নেন নি বলে আপসোস করেছেন, নিজেকে বৃদ্ধু বলে গাল দিয়েছেন।

॥ ১৩ ॥

বিয়ের পর বাবুরা মাইনে বাড়িয়ে পঁচিশ টাকা ক'রে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ঢের। ঘর ভাড়া দিয়ে সংসার চালিয়েও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু সঞ্চয়ের সে-ই একমাত্র পথ নয়। ও মাইনেটা উনি অনায়াসে তখন কাউকে দান করতে পারতেন। কারণ চুরিটা অব্যাহত রইল। বাবুরা নিজেদের জমিদারীর হাঙ্গামা আর ব্যবসার নানা সংকট নিয়েই বিব্রত, পূর্বপুরুষের এই নির্বুদ্ধিতা—মন্দির সদাব্রতর দিকে তাকাবার সময় ছিল না তাঁদের। ইদানীং ব্যাঙ্ক থেকে সুদের টাকাও মাধববাবুর হাতে

এসে পড়ত সরাসরি। বাবুরা ঝামেলা এড়াবার জন্যে সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিয়েছিলেন। সদাব্রত বা অতিথি খাওয়ানোর পালা কার্যত চুকেই গিয়েছিল, টিকিট খাতার হিসেব সবই ভুয়ো, মনগড়া।

তবে এদিকে চুরির পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গেলেও সব টাকাটা ওঁর ভোগে থাকত না। ইদানীং একজন ভাগীদার এসে জুটেছিল। আগের পূজারী হঠাৎ মারা গেলে তাঁর ভাগ্নে নতুন পূজারী হ'ল। সে স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়, তাছাড়া তার চোখ-কান একটু বেশী ধারালো। সে অর্ধেকের কমে রাজী হ'ল না। সব যায় দেখে বুদ্ধিমানের মতো তা-ই ছাড়লেন মাধববাবু। এর ওপর অতিথিশালার ঠাকুর-চাকরকেও কিছু কিছু দিতে হ'ত, নইলে তারা শুনবে কেন? ঐ সময়টা অন্যত্র কাজ ক'রে তারা কিছু কিছু রোজগার করে—এ-যুক্তিতে বেশীদিন চুরির ভাগে বঞ্চিত করা গেল না।

তবু এদিকের খরচটা সব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মাধববাবুর মোট আয়ের অঙ্ক খুব একটা কমে নি। তিনি ক্রমে এখানে এই জমি কিনলেন, একটা ছোট বাড়িও তুললেন। আস্তে আস্তে সে বাড়ি গতরে বাড়ল, দোতলা-তিনতলাও হ'ল। তিনি তাঁর কর্মস্থানের কাছাকাছি উত্তর কি মধ্য কলকাতাতেই জমি কিনতে পারতেন, কিন্তু তাতে সবাইকার চোখ টাটাবে, জানাজানি হয়ে পড়বে বলে সাহস করেন নি।

অবশ্য আরও খরচ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছেন। শাশুড়ির সম্পত্তি বলতে হাজার পাঁচেক টাকা পেয়েছিলেন। বাকী কিছু শেয়ার কোম্পানীর কাগজ তিনি জীবদ্দশাতেই মেয়ের নামে ক'রে দিয়েছিলেন—খুব বেশী নয়, তবে তার হাতখরচের পক্ষে যথেষ্ট—সেটায় হাত দিতে পারেন নি মাধববাবু। দরকারও হয় নি কোনদিন। লবঙ্গকে বললে যে তখন দিত না তা নয়,—উনিই বলেন নি। থাক না—মায়ের টাকা নাড়াচাড়া করুক। উনি এদিকে যতই খরচ করুন, দু-চার হাজার থোক তো আর হাতে

ধরে দিতে পারেন নি। বরং সংসার খরচ থেকে যা জমিয়েছে—মেয়ের বিয়ের, কি ঘর তোলার সময় তা সবই বার ক'রে নিয়েছেন।

ভালই চলছিল। আরও সুবিধে হ'ল এবারের এই যুদ্ধের বাজারে। আগে চাল-ডালের দাম চুরি করতেন—কোন কোন সময় লোক-দেখানো কিছু কিনতেও হ'ত—সেগুলো আবার লুকিয়ে বিক্রী করতে হ'ত বলে লোকসানও দিতে হয়েছে অনেক সময়—এখন রেশন চালু হ'তে মন্দির অতিথিশালার জন্যেও রেশন বরাদ্দ হ'ল, সেগুলোও গোপনে বিক্রী হ'ত কিন্তু দাম পাওয়া যেত কেনা দামের অনেক বেশী। ফলে সকলের যখন টানাটানি, ওঁর বাড়িতে তখন প্রচুর সচ্ছলতা। টিন টিন ঘি আসে, মিলিটারীর অতিরিক্ত ডিহাইড্রেটেড মাখন এনে বেটে খাঁটি ঘি করেন। এই গোরবেটার জাত, আঁটকুড়ির বেটারা, বৌ নাতিরা—তখন সেই খাঁটি ঘিয়ের হালুয়া লুচি জলখাবার খেয়েছে।

ছেলেদের লেখাপড়া কারুরই বেশী হয় নি। ম্যাট্রিকের গণ্ডী পার হয়েই থেমে গেছে সকলে। এক-আধ বছর কলেজে পড়ার শখ মিটিয়েছে—পড়ার ইচ্ছা ছিল না, শক্তিও ছিল না। একটা পাস যে হয়েছে সে-ই ঢের—বিশকম্মার বেটা বিয়াল্লিশকম্মা। তবে তার জন্যে কিছু আটকায় নি। মাধববাবু তদ্বির-তদারক ক'রে প্রায় সকলকেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ভাল ভাল চাকরি। যুদ্ধের বাজারে বা তার পরেও—চাকরির খুব অভাব ছিল না। পয়সা বাতাসে উড়ছে তখন। উনিও ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন—ঠিক ঠিক জায়গাতে তেল দিয়ে (শব্দার্থেই। তেল-ঘি যুগিয়েছেন যখন ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া টাকার থেকে জিনিস পেলে গিন্নীরা খুশী হন) কাজ বাগিয়ে নিয়েছেন।

অবশ্য এই সময় তাঁর চাকরিও গেছে। এত চুরির খবর কোনো-দিন কেউ বাবুদের কানে তুলবে না, তা সম্ভব নয়। উনি সবাইকে বন্দোবস্তমতো ভাগ দিয়ে এসেছেন বটে, তবে তার মধ্যে কিছু কিছু কারচুপিও করেছেন, সেটা ক্রমশ প্রাপকরা জানতে

পেরেছে। তাছাড়া তাদের ক্ষিদেও বেড়ে গেছে। মাইনের বেলায় যেমনই হোক, বাড়তি টাকার বেলায় কেউই এক অঙ্কে চিরদিন সন্তুষ্ট থাকে না। ন্যায্য-অন্যায্য সম্ভব-অসম্ভব বিচার করে না। এদেরই মধ্যে একজন গিয়ে লাগিয়ে দিল।

তবে চাকরি গিয়ে মাধববাবুর কোন অসুবিধা হয় নি। অসুবিধা হচ্ছিল চাকরি রাখতেই। পূর্বপুরুষের নির্ধারিত টাকার বাঁধা সুদ; তা বাড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমান মালিকরা এর জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে রাজী নন। অথচ জিনিসপত্রের দাম হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। সদাব্রতর খাতায় লিখিত অতিথি সংখ্যা বলে-কয়ে কমিয়ে দিয়েও কুল পাচ্ছেন না—আগেকার মতো টাকা বাঁচানো বা কমানো যাচ্ছে না। ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেন মাধববাবু।

বাঁচলেন মানে সময় পেলেন অনেকটা। স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। সে জন্যেও অমরবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ তিনি। অমরবাবু যে একটিও বাজে কথা বলেন নি, পরবর্তী জীবনে সেটা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই মাধববাবু অবসর সময়ে বড়বাজারে ঘুরতে শুরু করেছিলেন, চাকরি থাকতেই। আর সে ঘোরাটা নিষ্ফলও হয় নি একেবারে। কিছু কিছু আসতে শুরু করেছিল প্রায় সেই প্রথম থেকেই, এখন পুরোপুরি এর ওপরই ভরস্তুর করলেন।

এমনি অর্ডার সাপ্লাই বা দালালির কাজ তো ছিলই—হঠাৎ একটা নতুন পথ খুলে গেল। চোরাপথে অনেক বাইরের মাল এদেশে আসে, কাস্টম্‌স্ ফাঁকি দিয়ে। এর যে এতবড় একটা বিরাট ব্যবসা আছে তা আগে ধারণাও করতে পারেন নি মাধববাবু। এখন তার আকৃতি ও আয়তন দেখে চমকে উঠলেন। এবার এই কারবারেরই দালালি শুরু করলেন, তার মধ্যে ঘড়ি আর সিগারেটই প্রধান। খুবই খাটুনি হ'ত—গল্পের ভূতের মতো—কিন্তু এক এক সময় ওঁর মনে হ'ত ভূতও এত খাটতে পারে কিনা সন্দেহ।

সে খাটুনির পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পুরস্কার বলবেন না—মজুরীই। অনেক টাকা। তাতেই উৎসাহ, আর উৎসাহের ফলে কর্মশক্তি বেড়ে গিছল। একটা পঁয়ষট্টি সত্তর বছরের বুড়ো এত খাটতে পারে—নিজেকে দিয়ে না দেখলে তিনিও বোধ হয় বিশ্বাস করতেন না। অত ঘোরাঘুরিতেও ক্লান্তি বোধ হ'ত না। যখনই মনে হ'ত—অমুক জায়গায় আর একটু ঘুরে গেলে ঐ ছ'নম্বর মালটার সদ্‌গতি হবে, কমসে কম একশোটা টাকা থাকবে তাঁর হাতে—তখনই যেন পা চঞ্চল হয়ে উঠত, তখন মনেও থাকত না সকাল থেকে কত ঘুরেছেন তিনি।

কিন্তু লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। অতি লোভই কাল হ'ল।

সাহসও বেড়ে গিছল ইদানীং। মনে হ'ত এত খাটুনির উপযুক্ত মজুরী পাচ্ছেন না। এসব বাজে খাটুনীতে শুধু পরমায়ু নষ্ট হচ্ছে। গেলেন অল্পভার বহুমূল্য মাল ধরতে—সোনায় হাত দিতে।

তাতেও খুব অসুবিধে হয়ত হ'ত না—যদি হাত-পাতার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হাত-উপুড়ও করতে পারতেন। অনেক দুঃখকষ্ট সয়ে পয়সার ওপর মমতা পড়ে গিছল—দক্ষিণার দাবি শুনে মনে হ'ত এ তো সবই ওদের ধরে দেওয়া। তাঁর আর কি রইল তাহলে এত কাণ্ড ক'রে। ক্রমে এই মনোভাবটাতেই পেয়ে বসল তাঁকে—আর সেইটেই কাল হ'ল।

যা চেয়েছিল—হাজার দশেক—তা দিলেও পাঁচ সাড়ে পাঁচ থাকত তাঁর। কিন্তু এটাকে অবিচার মনে হ'তে আর সহ্য হ'ল না। তিনি মোট পাঁচ হাজার দিয়ে—যে লোকটি মধ্যস্থ তার গাল টিপে পিঠ চাপড়ে ছেড়ে দিলেন, মনে করলেন এতেই 'ম্যানেজ' হয়ে গেল। পাঁচ হাজার মুফৎসে পেয়ে গেল—এই কি কম? কিন্তু তারা টাকাও নিলে ওঁকে ধরিয়েও দিলে।

এতদিন ধরে যা এসেছিল—এই এক ধাক্কায় তার সবই প্রায় বেরিয়ে গেল। চিৎপাতের ধন উৎপাতেই চলে গেল বলতে গেলে।

জেল বাঁচাতে প্রায় ষাট-সত্তর হাজার গলে গেল। তবু তো ওঁর উকিল বললেন, উনি নাকি অল্পে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন—বুড়ো বলে, আর আগের কোন দাগ নেই বলে।

॥ ১৪ ॥

আঘাতটা আর সামলাতে পারলেন না মাধববাবু। তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তিও এবার তাঁকে ত্যাগ করল। এতগুলো টাকার শোক পুত্রশোকের বাড়া। তাছাড়া দুশ্চিন্তা। দুটো মিলে কাবু ক'রে দিল তাঁকে। অর্থশোক বলেই এত চিন্তা যথাসর্বস্ব গেল বলেই। অথচ খরচ না ক'রেও পারলেন না। জেল খাটাটা হয়ত অত ভয়ানক ব্যাপার নয়, সত্যিসত্যি কিছু একটা বুড়ো লোককে দিয়ে ঘানি টানাত না তারা - জেল হবার অপমানটাই মর্মান্তিক, বংশ পরম্পরায় ভোগ করতে হ'ত। স্ত্রী-পুত্র আর কোনদিন মুখ তুলতে পারবে না—এই চিন্তাটাই সবচেয়ে বড় হয়েছিল সেদিন।

এতদিন তারাও জানত না তিনি ঠিক কোন্ পথে এত পয়সা উপায় করেন। দালালী করেন এমনি একটা অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা কথা শুনত তারা। এখন আর চাপা গেল না। শুনে ছেলেরা মেয়েরা - স্ত্রী, সকলেই তিরস্কার করতে লাগল। 'কী দরকার ছিল তোমার এই বয়সে এই সব ঝুঁকির কাজ ক'রে পয়সা রোজগার করার! কেন, আমরা কি খেতে পাচ্ছিলুম না? ছি-ছি, তুমি শেষে স্মাগলারের কাজ করতে গেলে বুড়ো বয়সে!' এই কথাই বলতে লাগল তারা জনে জনে। একই বক্তব্য, একই অভিযোগ। হয়ত ভাষার একটু হেরফের হ'ল মানুষ হিসেবে—এই মাত্র।

তিনি একাজ না করলে তাদের এত লপচপানি কোথা থেকে হ'ত--সে কথাটা কারও মাথায় গেল না, কোন বেটাবেটির। এই বাজারে কার কত সঙ্গতি -তা তো আর মাধববাবুর জানতে বাকী নেই।

এরপর ঘোরাটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সসম্মানেই অব্যাহতি পেলেন বটে, কিন্তু বছরখানেক ধরে এই ছুটোছুটি অর্থব্যয় কষ্ট আর দুশ্চিন্তা ভোগ করার ফলে শরীর ভেঙে পড়ল, একেবারে যেন জন্তু হয়ে গেলেন। মাথা ঘোরে অবিরত, একটু হাঁটলে কি একটু উত্তেজনা হ'লেই বুক ধড়ফড় করে। তখন যেন নিঃশ্বাস নিতেই পারেন না ভাল ক'রে--চলা কি কথা বলা তো দূরের কথা। একটু সাধারণ দালালীর চেষ্টা দেখবেন অল্পস্বল্প—সে পথও বন্ধ হ'ল। বড়বাজারে দু'দিন মাথা ঘুরে পড়ে যেতে ছেলেরা রাগারাগি ক'রে বেরুনোই বন্ধ করলে। মেজ ছেলে গোঁয়ার বেশী, সে ভয় দেখালে, 'কথা যদি না শোন, ঘরে চাবি দিয়ে রাখব।'

কথা না শুনে উপায়ও ছিল না অবশ্য। ওঁর নিজেরও ভরসা চলে গিছল। শেষে কি পথেই মরে পড়ে থাকবেন কোনদিন, বাড়ির লোক কেউ একটা খবর পর্যন্ত পাবে না! লাশটা মুদ্দফরাশে নিয়ে গিয়ে মর্গে তুলে দেবে, ছেঁড়াকাটা করবে। বাপ রে, মনে হ'লেই প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে।

আমদানী বন্ধ হ'ল, উলটে বেনোজল এসে ঘরোজল বার ক'রে নিয়ে গেল। ফলে, এবার ঘরে যেটুকু যা আছে, তার চিন্তাটাই প্রবল হ'ল।

অবসরও অনেক। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে, ঘোরাঘুরি করলে বাজে চিন্তার সময় থাকে না। খাটাখাটুনির ফলে রাতেও বিছানায় পড়লেই চোখ জড়িয়ে আসে। এখন একটু টুকটাক যা সংসারের কাজ করেন, বাকী সবটাই চিন্তা। রাতেও ঘুম হয় না ভাল, দুটো আড়াইটেয় ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে কেবল নিজের জীবনটার কথা, কী থেকে কি করলেন এবং কীভাবে এতদিনের পরিশ্রমের ফল বেরিয়ে গেল—এ সবই ভাবেন।

এর মধ্যেই একদিন শুনলেন, এতদিন অত জানতেন না, মানে শুনলেও এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আসে নি- সম্পত্তি রেখে মরে গেলে—যে বা যারা পাচ্ছে তাদের মোটা মোটা টাকা ট্যাক্স

দিতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য বললে যে, লাখ টাকার সম্পত্তি না হ'লে দিতে হয় না, কেউ আবার বললে পঞ্চাশ হাজার। আবার কেউ বা ভয় দেখালে শিগ্‌গিরই নতুন আইন হচ্ছে, যা কিছু রেখে যাবেন তার ওপরই 'ডেথ ডিউটি' দিতে হবে।···আর যদি লাখ টাকার ওপরেই হয়—তাতেই বা সুবিধে কি,—সম্পত্তির দাম ধরবে তো ঐ ওরা, ত্রিশ হাজারের বাড়িও ওরা লাখ টাকা বলে দিতে পারে। আর বাড়িও তো তাঁর এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, সব মিলিয়ে বারো-তেরো খানা ঘর—লাখ টাকা দাম তো হেসেখেলে। কর্পোরেশনের ভ্যালুয়েশান অবশ্যই কম—কিন্তু তাই যে ওরা মানবে তার ঠিক কি! ওঁর ছেলেরা যা হাঁদা—ওরা কি পারবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে ভ্যালুয়েশন কমাতে? উনি বেঁচে থাকলে উনিই করতে পারতেন—এখনও এটুকু বিষয়বুদ্ধি বা সাংসারিক জ্ঞান আছে—কিন্তু তখন তো আর তিনি থাকবেন না, তখন এ হ্যাপা কে সামলাবে?···

বন্ধু বলতে জীবনেই কেউ ছিল না, কোনদিন কাউকে প্রাণের কাছে টানবার চেষ্টাও করেন নি—দু-চারজন তথাকথিত বন্ধু যা ছিল—তাদের কাছে গেলেন পরামর্শ চাইতে। একজন বললেন, 'তুমি মরার পর কি হবে, তা নিয়ে তোমার অত চিন্তা কেন? ওরা পারে রাখবে—না পারে বিক্রী ক'রে দেবে, টেক্‌সো চুকিয়ে বাকী যা থাকবে তাই নিয়ে ভাড়াবাড়িতে গিয়ে উঠবে।'

কথাটা পছন্দ হ'ল না মাধববাবুর।

আর একজন বললেন, 'এখন থেকেই ছেলেদের দানপত্র ক'রে দাও—ল্যাঠা চুকে যাক। তুমি আছ, ভ্যালুয়েশন কমিয়ে ধরাতে পারবে—গিফট্‌ ট্যাকস্‌ও লাগবে না।'

আবার একজন বললেন, 'আরে, ছেলেমেয়েদের সবাই তো পাবে—ছ'টা ভাগ হবে তোমার—মিলেমিশে দেবে'খন।'

ফলে আবার এই এক চিন্তা বাড়ল। জানতেন কিন্তু মনে ছিল না কথাটা। অত খরচ ক'রে মেয়েদের বিয়ে দিলেন, তখন

তো হুয়ে নিংড়ে নিয়েছে এক এক যমের দূত বেয়াই, আবার বিষয়েও ভাগ বসাবে জামাই বেটারা।

আইন ঠিক জানেন না, কিছু বোঝেনও না—বোধহয় সেই জন্যেই একটা অকারণ আতঙ্ক বোধ করেন। উকিলে তাঁর অতিরিক্ত ভয় হয়ে গেছে এই মোকদ্দমাটায়। মেয়েদের ভাগ দিতে হবে, সম্পত্তি রেখে গেলে ডিউটি দিতে হবে—এ আইন যে আছে তা তো সবাই জানে। কত দামের সম্পত্তিতে ডিউটি লাগে এই কথাটা জানতে পারেন নি বটে, তা তিনি তো বেশীটাই, লাখ টাকাই ধরে নিচ্ছেন—তবে আর উকিলের কাছে গিয়ে লাভ কি? নতুন কথা আর তারা কি বলবে?

অনেক ভাবলেন। যতই ভাবেন ততই যেন দুশ্চিন্তা বাড়ে—ভাবনার কুল-কিনারা পান না। শেষে একজন ভূতপূর্ব অফিসার—সন্ধ্যায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে-বসে-আড্ডা-দেবার এক বন্ধুর পরামর্শে স্থির করলেন, আগে মেয়েদের দিকটা পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। এইটুকু বাড়ি, এর ছ'ভাগ হবেই বা কোথায়, আর হ'লেই বা কি থাকবে। তাছাড়া জামাইয়ের গুষ্টি এর মধ্যে এসে সেঁধুবে--সেটাও তাঁর অত্যন্ত অরুচিকর বোধ হ'তে লাগল।

আরও কিছুদিন কথাটা মনে মনে তোলপাড় ক'রে মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আড়াই হাজার টাকা ক'রে তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা একটা ক'রে না-দাবি-নামা লিখে দিয়ে যাও।'

বড় ও মেজ মেয়ে ভাববার সময় চাইল, স্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করবার। তার অস্ত্রও তৈরী ছিল মাধববাবুর, 'আমি উইল কি দানপত্র ক'রে দিলে কিছুই পাবি না, এক পয়সাও—সে আইন তো জানিস। এ হিন্দুর সম্পত্তি, এখানে দায়ভাগ আইন। যা দিতে চাইছি, না নিলে এও পাবি না।'

বড় দু'জন রাজী হয়ে গেল। রাজী হ'ল না ছোট মেয়ে অঞ্জু। সে কেঁদেকেটে, না খেয়ে চলে গেল। বললে, 'আমি এক পয়সাও চাই না, কিছু লিখেও দেব না। সব জেনেশুনেও যদি তোমার এই

বিবেচনা হয় তো হোক। মামলার ক্ষমতা নেই, থাকলেও করতুম না, তুমি নিশ্চিন্তি থাকো। ভাগে গেলে তো পেতুম দু'খানা ঘর, তাতেও যদি তোমার বুকে এত বাজে তো থাক, চাই না।...তবে এও বলে যাচ্ছি, ছেলেরাই তোমার কাছে এত বড় হ'ল! তাদের জন্যে আমাদের হক্কের পাওনা থেকে বঞ্চিত করছ—একদিন বুঝবে, যদি বেঁচে থাকো—কে তোমার কত আপন। ছেলেরা কি স্বগ্‌গে বাতি দেয় দেখে যেন মরতে পারো।'

মেয়েটার অভিশাপ যে এমনভাবে ফলবে তখন কে ভেবেছিল!

তখনও মনটা খারাপ হয়েছিল বৈকি! সত্যিই অঞ্জু এ অনুযোগ করতে পারে। বেশী টাকা হাতে থাকলে ওকে একটা ছোট বাড়ি ক'রে দিতেন। এখন আর সম্ভব নয়। যা আছে তা সব দিলেও কোন ভদ্র জায়গায় এক কাঠা জমি কিনে একখানা ঘরও উঠবে না।

যখন হাতে ছিল তখনও অবশ্য দেন নি। লবঙ্গ বলেছিল অনেকবারই। তাকে বুঝিয়েছিলেন, 'দিয়ে লাভ কি? ঐ হাভাতে গুড-ফর-নাথিং জামাইটা কি রাখবে? তোমার মেয়েও যা হাঁদা-কাত্তিক—জামাই বললেই সুড় সুড় ক'রে সব লিখে দেবে। তার চেয়ে এই কিছু কিছু দিচ্ছি---এই ভাল।'

দিতেনও সত্যিই কিছু কিছু। মাসে পঁচিশ ত্রিশ দিতেন, যে মাসে যেমন খুশি। বেশী দিতেন না সেও ঐ হতভাগা জামাইটার ভয়েই। দিন কোনমতে চলে গেলে আর কোন রোজগারের চেষ্টাই করবে না।...

অঞ্জুর পেছনেই বেশী খরচ করেছিলেন অথচ ওর বিয়েই সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। উনি এত বুদ্ধিমান কিন্তু এই একটা জায়গায় চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য নির্বুদ্ধিতাই বা কি, সাধারণ যা খোঁজখবর করবার সবই করেছিলেন, এমন যে হ'ল---নেহাৎই মেয়ের ভাগ্য বলতে হবে।....ভাগ্য ছাড়া কি, এই মেয়েই ওঁর সবচেয়ে সুন্দরী, বাপ-মায়ের চেহারা মিলিয়ে দেখতে

হয়েছিল---ফুলের মতো মেয়ে। ওর তো আজ রাজার ঘরে পড়বার কথা!

রাজার ঘরে না হোক, ভাল ঘরেই দেবার কথা মনে ছিল তাঁর। দমদমে তেতলা বাড়ি, নিজেদের গাড়ি আছে, জামাই ব্যবসা করে —শ্যামবাজারে মনোহারীর দোকান—এই দেখেই দিয়েছিলেন। একদিন-তু'দিন নয়---অন্তত আট-ন'দিন গেছেন নানা কারণে, নানা ছুতোয়। একদিনও আসল অবস্থাটা জানতে পারেন নি। উনি কারবারী জামাই-ই চেয়েছিলেন, বরাবরই। বড় তুই মেয়ের বেলায় তা হয়ে ওঠে নি—এবারে এই লোভটাই বড় হয়েছিল। তাছাড়া এদের অবস্থা ও দোকানের চেহারা দেখেও খুশী হয়েছিলেন।

সেই জন্যেই আরো টাকার পরোয়া করেন নি, ঢেলে দিয়ে-ছিলেন। তিন হাজার টাকা নগদ, চল্লিশ ভরি সোনা। খাট-বিছানা আলমারীও দিতে চেয়েছিলেন, ওর জ্যাঠতুতো দাদাটা বলেছিল, 'আজ্ঞে, ওর সবই তো আছে, আপনার আশীর্বাদে অভাব বলে তো কিছু নেই—তবে যদি দিতে চান, টাকাটাই ধরে দেবেন আগে, পছন্দমতো করিয়ে দোব।' এই বলে আরও আটশো টাকা আদায় করেছিল। সেটা জলেই গেল—ওদের বাবার আমলের পুরনো খাট আলমারীতে রং পালিশ লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল---তাতে বোধহয় পঞ্চাশটা টাকাও খরচ হয় নি।

বিয়ের কিছুদিন পরেই তাসের বাড়ি ভেঙে পড়ল।

প্রথমেই মিলিয়ে গেল গাড়ি। শুনলেন বড ভাইয়ের শালার একটা মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা আছে, তাদেরই কোন মক্কেল কারখানায় গাড়ি রেখে আড়াই মাসের জন্যে কোথায় বাইরে গিছল, সেই গাড়িখানাই ব্যবহার করছিল এরা।

তবু এ তুচ্ছ। গাড়ি না থাকলেই যে অবস্থা খারাপ হবে তার কোন মানে নেই। এর কিছুদিন পরে যা শুনলেন সেইটেই চরম। বাড়ি মেজবৌয়ের উকিল বাপ মেয়েকে দিয়েছিলেন। প্রথমটা সে

সংসার ভিন্ন করতে চায় নি, কিন্তু বড়বৌ দজ্জাল ঝগড়াটে, বড়ভাই কৃপণ—এক পয়সার মা-বাপ। সংসারে কিছুই দিতে চায় না সে, তার যুক্তি মেজভাইয়ের অনেক টাকা, তারই খরচ করা উচিত। এইসব দেখেশুনে এবার মেজবৌ নোটিশ দিয়েছে। আগেই বাড়ি খালি ক'রে উঠে যেতে হ'ত, শুধু ছোট দেওরের বিয়ের কথা চলছে দেখে চক্ষুলজ্জায় ক'টা মাস চুপ ক'রে ছিল।

বিয়ে চুকতেই সে জোর তাগাদা দিলে বাড়ি ছাড়বার।

বড়ভাই দু'খানা ঘর ভাড়া ক'রে উঠে গেল। ছোটরই আতান্তর। আতান্তর একদিকেই নয়---আরও শুনলেন মাধববাবু—জামাইয়ের ব্যবসা ছিল আর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে, পুঁজি সেই বন্ধুরই। এ চাকরিই করবে। তবে ঠিক মাইনের চাকর নয়---ওয়ার্কিং পার্টনার ক'রে নিয়েছিল সে বন্ধু। মাসে পঞ্চাশ টাকা হাতখরচ পাবে আর টাকায় দু'আনা মুনাফার অংশ। মুনাফার অংশ থাকলে প্রাণপণে খাটবে, নিজের কারবারের মতো ক'রে— এই ভেবেই এ বন্দোবস্ত করেছিল ছেলেটি---কিন্তু জামাইটা একেবারেই নাকি অকর্মণ্য, রোজই প্রায় দেরি হয় আসতে, বসে বসে ঘুমোয়। কাজকর্ম বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে না, কোথায় কোন্ মালটা থাকে তাও খোঁজ রাখে না। বাজার করতে দিলে টাকা হারিয়ে আসে---এখানে খদ্দেরকে এক টাকার চেঞ্জ দিতে দশ টাকার চেঞ্জ দিয়ে বসে। সে বন্ধু ব্যাপার-গতিক দেখে জবাব দিয়েছে।

তারপর ভাগ্যবিপর্যয়ের ধাক্কা খেতে খেতে এসে এখন চরম দুর্গতিতে পৌঁচেছে। এখন একটা পার্কের ধারে গ্যারেজ-ঘরে ভাড়া থাকে--তার মধ্যে কাপড় টাঙিয়ে আড়াল ক'রে রান্না-খাওয়া; তার মধ্যেই কারবার। কারবার অবশ্য নামেই। মেয়ের অনুরোধে মাধববাবুই একটা সেলাইকল কিনে দিয়েছিলেন; জামাই বাইরে বসে মাপ নেয় অর্ডার নেয়---মেয়ে আড়ালে সেলাই করে, মেয়েদের ব্লাউজ ফ্রক ইত্যাদি। তাই বা কে অত করাচ্ছে। এখন ওসব কেনাই সুবিধে, তৈরি করানোতে লোকসান।

ঐ গ্যারেজ-ঘরেই তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে কাটাতে হয় মেয়েটাকে। এসব সত্ত্বেও সে স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসে, নিজের যা কিছু ছিল অকাতরে সব বার ক'রে দিয়েছে—এত দুঃখেও কখনও একটা কড়াকথা কি কটূকথা বলে না, কোন অনুযোগ করে না। সেলাইয়ের কাজ না থাকলে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে ঠোঙ্গা গড়ে, ক্যারম-বোর্ডের জাল বোনে। তাও মূলধন থাকে না এক এক সময়, যে পুরনো কাগজ কি সুতো কিনবে। বাসাও তেমনি, বাথরুম নেই। শেষরাত্রে উঠে পার্কে গিয়ে কাজটা সেরে আসতে হয়। গভীর রাত্রে বাইরে উনোন ধরিয়ে বসে রাঁধে—নইলে নাকি দোকানের 'ইজ্জত' থাকে না—সেই সময়ই পরের দিনের দুপুরের জন্যে তোলা থাকে খাবার। এইভাবেই দিন কাটাচ্ছে। ছেলে-মেয়েগুলো পাঁড় মুখ্যু হচ্ছে। কর্পোরেশনের ইস্কুল পর্যন্ত দৌড় সকলকারই, মানে যদ্দিন বিনে পয়সায় হয়েছে। অথচ ওদের মাথা ছিল। লেখাপড়া হ'তে পারত। বড়টা একজনের বাড়ির বাজার ক'রে দেয়, সে সেখানেই খায়, সে বাবুটি নাকি দয়া ক'রে একটি ছাপাখানায় কম্পোজিটারী শেখার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। ছোট ছেলেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে ডাংগুলি খেলে বেড়ায়। মেয়েটা তবু মায়ের কাছেই থাকে—তবে তার পড়ার চাড় খুব, পাড়ার অন্য ছেলেদের কাছ থেকে ইস্কুলের বই চেয়ে এনে রাস্তার আলোয় বসে বসে পড়ে।

জামাইবাবাজী কিন্তু নির্বিকার। অনেক দিন আগে ট্রেনে নৈহাটি যেতে হয়েছিল। গাড়িতে এক বক্তা লোক উঠেছিল, খুব বড় বড় কথা বলছিল, তার মধ্যে একটা কথা মনে আছে মাধববাবুর—সাংখ্যের পুরুষ। সে নাকি শুধুই সব বসে বসে দেখে—কিছুই করে না, কোন কুকাজেও বাধা দেয় না, সুকাজেও উৎসাহ দেয় না। সাংখ্য কোন্ দেশ তা উনি জানেন না, সেখানের পুরুষরাই বা এমন কিনা, না কি ওটা কোন পুঁথি, আসলে ভগবানের কথাই ঐভাবে লেখা হয়েছে—তা আজও ঠিক বুঝতে

পারেন নি। তবে জামাইয়ের কথা ভাবতে গেলেই ঐ কথাটা মনে পড়ে যায়।

এসব কোন ছঃখকষ্ট, অন্ধকার ভবিষ্যৎ, কিছুই তার গায়ে লাগে না। লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু নেই, কিছু ভাববার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা কোনকালে ছিল না।

তবে হ্যাঁ, বৌয়ের ওপর লোক-দেখানো ভালবাসাটা খুব আছে। এক-একদিন কেরোসিন তেলের পয়সা জুটলে আলো নেভাতে দেয় না, বলে, 'তোমার মুখটা দেখব ভালো ক'রে।' সত্যি সত্যিই নাকি এক-একদিন সারা রাত বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে জেগে কাটিয়ে দেয়। পাঁড় বোকা মেয়েটা তাইতেই গলে আছে—এই কষ্টটা হাসিমুখে সয়ে যায়।

মায়া হয় বৈকি। মন কেমন করে। কিন্তু তিনি নিরুপায়। তাঁর হাতেও আর কিছু নেই। ছেলেদের ডেকে অনুরোধ করেছেন তারা যেন এই বোনটাকে মাসে দশ টাকা ক'রে দেন। তারাও রাজী হয়েছে। কিন্তু সব মাসে সবাই দেয় না—এও তিনি জানেন। বলতে গেলে উল্টে তাঁকেই ছ'কথা শুনিয়ে দেয়। তাদেরও তো সংসার আছে, এই টানাটানির বাজার—একটা বিয়ে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন হ'লে আর তাল সামলানো যায় না। কেউ তো লাটসাহেবের চাকরি করে না তাদের মধ্যে—নিজের ছেলেমেয়েকে দেখে তবে তো বাপের মেয়ের কথা ভাববে।

॥ ১৪ ॥

শেষ অবধি তিন ছেলেকে বাড়ি বখরা ক'রেই দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছিল দেবোত্তর ক'রে দিতে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেকে সেবাইত করতে। সে পরামর্শ মনে ধরে নি—ছেলেদের দিয়েই দিয়েছেন। দানপত্র নয়, মিথ্যে মিথ্যে বিক্রী কোবালা। যেন

মোকদ্দমার দেনা সামলাতে না পেরে ওদের কাছে সামান্য টাকায় বিক্রী ক'রে দিচ্ছেন।

এই দেবার সময়ই ছেলেদের সঙ্গে কড়ার হয়েছিল যে, তিনি বড়ছেলের সংসারে খাবেন, গিন্নী খাবেন মেজছেলের কাছে। ছোটছেলে কাপড়-জামা এবং চা-জলখাবার দেবে।

প্রথম প্রথম এক রকম চলেছিল তবু। তার কারণ তখনও তাঁর হাতে কিছু ছিল, দায়ে-অদায়ে বার ক'রে দিতে পেরেছেন। কিন্তু সেটা আর বেশীদিন রইল না। বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে যায়, কলের পাইপে টিউবওয়েলের জলের চুন জমে বুজে গেছে, ভেতরে জল আসে না; ইলেকট্রিকের লাইন না বদলালে অতিরিক্ত বিল গুণতে হয়—এসব দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারেন নি। নিজেই কিছু কিছু বার ক'রে এসব করিয়েছেন। শেষ যা ছিল—বাড়িটা ঝেড়ে মেরামত করিয়ে কলি-রং ধরাতেই যথাসর্বস্ব শেষ যা হাজার তিন সাড়ে তিন হাতে ছিল নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাড়িটা যে ওঁর নয় আর—থাকল কি গেল তাতে ওঁর কিছুই এসে যায় না, ওঁর পরমায়ুও যে শেষ হয়ে এসেছে—আরো অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবার কথা, বাড়ি যতদিনই বে-মেরামতে থাক—একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার অনেক আগেই তিনি নিশ্চিত পালিয়ে যাবেন—এই রূঢ় সত্যটা কিছুতেই মনে থাকে না।

আর মনে থাকলেই বা কি, যতই হোক সন্তান। তাঁরই, তাঁদেরই সন্তান। এই যে সেজ নাতিটা—অম্বুজ, মেজ ছেলের মেজ ছেলে—কী এক অসুখ হ'ল, বুকের কোন্ শিরা না নল ছিঁড়ে ভেতরে ভেতরে রক্তপাত শুরু হ'ল, কিছুতেই সে রক্ত থামে না। এক বছর শয্যাশায়ী হয়ে রইল, বাঁচার কোন আশাই ছিল না। কোন ডাক্তার কোন ভরসা দিতে পারে নি। উনি কি পেরেছিলেন চুপ ক'রে বসে থাকতে? রাতের পর রাত তো জেগে কাটিয়েছেনই — মেজ ছেলের হাত খালি হয়ে গেল, আপিস থেকে ধার করারও পথ রইল না, দৈনিক একশো সওয়াশো টাকা খরচা—বৌ নিজের

সব গয়না ছাড়তে রাজী হ'ল না, বললে, 'আমার আরও চারটে আছে, এরপর তাদের কারও কিছু হ'লে কে দেখবে? একজনের জন্যে পথের ভিখিরী হ'লে ধর্ম্মে পতিত হবো যে।' তখন বাধ্য হয়ে ওঁকে দু'খানা দামী শেয়ার বার ক'রে দিতে হয়েছে, তাতেও থৈ পায় নি—সেই কবেকার পোস্ট আপিসের একটা খাতা ছিল, সেখানে দীর্ঘদিনের সুদ জমে সুদে আসলে এগারোশোর মতো দাঁড়িয়েছিল—তাও তুলে দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত লবঙ্গকে বলে বুঝিয়ে বারো ভরির কেবল্ হারটাও বার করিয়ে দিয়েছেন।

সেই মেজছেলে মেজবৌ কি সে কথাটা মনে রাখল?

তখনই কি রেখেছিল?

রাত জাগতে হ'ত বলে মেজবৌকে বলেছিলেন, ফ্ল্যাস্কে একটু চা ক'রে রেখে দিতে—সেটা অর্ধেক দিনই ভুল হয়ে যেত। মনে করিয়ে দিলেও স্যাকারিন দিয়ে ক'রে রাখত। বলত, 'চিনি তো মাপা—আমার ছেলেমেয়েরা যে গাদাগাদা চিনি খায়—আর চিনি পাবো কোথায়? উনি খেতে না পারেন—চিনিটা অন্তত এনে দিন।'

মানুষকে চিনে নিয়েছেন বলে মাধববাবুর একটা ধারণা ছিল, এই সর্বস্বান্ত হবার পর সে ধারণা, সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। প্রথম ধাক্কা খেয়েছিলেন ছোট মেয়ের বিয়েতে, কিন্তু দেখা গেল তাতেও মানুষ চেনার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি তাঁর।

মাধববাবুর বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপ ছবিটাই তিনি দেখে নিয়েছিলেন—এখন দেখলেন তাঁর কল্পনা এ বাস্তবের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে নি।

কোনো ছেলে এবং ছেলের বৌ—তাঁর মতো বাপ, যে প্রাণপাত করেছে ওদের জন্যে, এখনও যার তৈরী ক'রে দেওয়া বাড়িতে বাস করছে, যার ক'রে দেওয়া চাকরির দৌলতে মুখে অন্ন তুলছে, সেই

বাপের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করতে পারে—তা তাঁর ধারণার অতীত ছিল।

ছোট বৌয়ের হাতে চায়ের ভার। সে কুঁড়ের একশেষ, সাতটায় ওঠে—চা করতে তার সাড়ে সাতটা বাজে। আসলে এইরকমই তার অব্যেস চিরদিনের। ঠিক বাঙ্গালীও তো নয়। ছেলে অজয়বাবু, তাঁর কুলের ধ্বজা, একালের আমদানি উনিই করলেন এ বাড়িতে। ফুটবল খেলতে আসাম গিয়ে এই কাণ্ডটি ক'রে এলেন। এক-একজন খেলোয়াড়কে এক-এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রেখেছিল তারা। অজয় যার বাড়ি ছিল তারই মেয়ে এটি। বেকার উকীল, হাড়-বজ্জাত। কে জানে ঐ মতলবেই রেখেছিল কিনা! নইলে সাত দিনেই 'লব' একেবারে পাকা হয়ে গেল! এখানে ফিরে আসার পর মা চামুণ্ডাও ধাওয়া ক'রে এলেন, ছেলেটা যেন জুজুর ভয়ে সুড় সুড় ক'রে গিয়ে রেজেস্টারী ক'রে এল।

মেয়েকে পরে জেরা ক'রে বা আরও খোঁজখবর ক'রে যা জেনেছেন মাধববাবু, জন্মেরই দোষ ওর। বাবা বাঙ্গালী ঠিকই —কিন্তু মা পাহাড়ী। উনিও ঐ কম্ম করেছিলেন। খাসিয়া না কি বলে যেন—সেই জাতের। দেখতে সুন্দর অবিশ্যি—নাকটাকও চাপটা নয় পাহাড়ীদের মতো কিন্তু একেবারেই মাকাল ফল। অকর্মার ধাড়ি। সেখানে ঠাণ্ডার দেশে বেলায় ওঠা অব্যেস— সেইটেই ছাড়তে পারে না—তবু তো নটা-দশটা থেকে সাতটা ক'রে এনেছে। ছোটবাবু বৌয়ের হয়ে কৈফিয়ত দেন। কিন্তু মধ্যে যে চাকরি করাবার শখ হয়েছিল, কোন এক দিশী ফার্মে চাকরি পেয়েও ছিল—সে কাজ রইল না কেন? যতই যা হোক, তাদেরও তো দরকারের জন্যেই নেওয়া, হপ্তায় যদি তিনদিন কামাই হয় আর একদিনও সময়ে না যেতে পারে—কদ্দিন রাখবে তারা? একদিনও যে বারোটার আগে পৌঁছতে পারেন নি মা-ঠাকরুণ।

তবু বড়ছেলেটা উঠে মার অনেক কাজ ক'রে দেয়। উনুনে আঁচ দিয়ে ভাত চাপিয়ে মাকে ডাকে। কিন্তু সে চা করতে

পারে না, বা ঐ দায়টা ঘাড়ে নিতে চায় না। এধারে মাধববাবু ওঠেন রাত চারটেয়। তখন থেকে একটু চায়ের জন্যে হানটান করেন। চিরদিনের অব্যেস ওঁর ভোরে চা খাওয়া। বড়বৌয়ের ঘরে ছটার মধ্যে চা হয়—সাড়ে ছটায় দু-প্রস্থ সারা হয়ে যায় চায়ের পাট। কিন্তু তা থেকে আধকাপ চাও সে শ্বশুরকে দেয় না কোনদিন—যেহেতু সে রকম কথা নেই। এক-একদিন রাগ ক'রে উনি বেরিয়ে পড়েন, ফিরে আসেন অবিশ্যি সাড়ে সাতটার মধ্যেই —কিন্তু দেখেন হয়ত সেই দিনই ছোটবৌ সকাল ক'রে উঠে চা করেছে, তাঁর চা খোলা এক জায়গায় পড়ে আছে, ঠাণ্ডা জল, হয়ত বা দু-চারটে মাছিই পড়ে আছে তাতে—তার সঙ্গে একখানা সেঁকা পাঁউরুটির টুকরো, সেটা ঠাণ্ডা হয়ে কাঠের আকার ধারণ করেছে, তাঁর মতো দন্তহীন লোকের তা খাওয়া সম্ভব নয়।

বড়বৌয়ের কাছে তাঁর দুবেলা খাওয়ার কথা। নাতিদের ভাষায় 'প্রিন্সিপাল মীল'। সেখানেও তাঁর ভাগ্য ঠিক তৈরী আছে। বড়ছেলে আর ইস্কুল-কলেজে-যাওয়া নাতিনাতনীরা বেশির ভাগই নটা-সাড়ে নটার মধ্যে খেয়ে নেয়। বাকী থাকে ঐ 'নেতা' আর বেকার বাউণ্ডুলে একটা নাতি। তারা আসে কোনদিন দেড়টা-দুটোয়, কোনদিন বা তিনটে-চারটেয়। বৌমা নিজে খান বেলা আড়াইটেয়। কাজকর্ম সেরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চান করতে যান। নিজের সঙ্গেই শ্বশুরকেও খেতে দেন—ঠাণ্ডা কড়কড়া, যেদিন একটু শক্ত নামে, সেদিন সেগুলো আবার চালে পরিণত হয়। বৌমা নাকি শক্তই পছন্দ করেন, বুড়োমানুষের কষ্ট তাঁর মনে থাকে না। সে কথা মনে করিয়ে দিতে গেলে বলেন, 'চৌদ্দবার ভাত বাড়তে পরিবেশন করতে পারব না। সংসারের কাজ তো আর এতটুকু নয়, একটি দুটিও নয়। সারাদিন হাঁড়িহেঁসেল নিয়ে বসে থাকলে সেগুলো করে কে? অতই যদি গরম খেতে হয়—উনি যেন সাড়ে-নটায় খেয়ে নেন।'

এতেই লাঞ্ছনার বা দুর্গতির শেষ নয়। যেভাবে আর যা খেতে দেয়—অমন বোধহয় পথের কুকুরকেও খেতে দেয় না মানুষ। তাঁর ডালে যে জল মিশোয় বড়বৌ, তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। মাছ প্রায়ই তাঁকে দিতে 'ভুল' হয়ে যায়। একটা ঘ্যাঁট তরকারি বা চচ্চড়ি হয় -সেটাও পাতে পড়ে নাম মাত্র। রাতে শুকনো কাঠ হয়ে যাওয়া রুটির সঙ্গে ঠিক এক ফোঁটা একটু তরকারি এবং ঐ জলবৎ ডাল। ডিমের ডালনা কি মাংস হ'লে এসবের বদলে তার ঝোল আর একটা বড় আলুর টুকরো—এই বরাদ্দ।

লবঙ্গর অবস্থা আরও খারাপ। মেজবৌ যে এত দজ্জাল তা আগে ওঁরা কেউই বোঝেন নি। সে অবশ্য অত খারাপ খেতে দেয় না তার বড় জায়ের মতো, তবে হাতের রান্না ভাল নয় (সে নাকি বড়লোকের মেয়ে, কখনও রান্না করে নি। মাধববাবু জানেন ওর বাবার আসল অবস্থা—পৈতৃক বাড়ি পর্যন্ত বাঁধা)। তা আর কী করা যাবে—কিন্তু শাশুড়ির জন্যে অতিরিক্ত কাল্পনিক মেহনৎ করতে হয় বলে দু'বেলা যে অপমান আর গালিগালাজ করে সেইটেই মর্মান্তিক। সে শুনলে মরা মানুষেরও রক্ত গরম হয়। অবশ্য আইনে ফেলার উপায় নেই—কখনও সে সোজাসুজি শ্বশুর কি শাশুড়ির নাম করে না।

প্রথম প্রথম ওঁর ভেতরের কর্তৃপুরুষ বিদ্রোহ করেছে। পূর্ব অভ্যাসমতো বৌদের তিরস্কার করতে গেছেন --তার জবাবে শুনতে হয়েছে তারা কেউ ওঁদের কেনা গোলাম নয়, ওঁদের খায়-পরে না। তারা কেন ওঁদের চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি শুনতে যাবে? ওঁদের না পোষায় ওঁরা অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিন। ছেলেদের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত হয়েছে সেটা ছেলেদের সঙ্গেই ওঁরা যেন ফয়সালা ক'রে নেন, তারা সে কথার দায়িক নয়।

ছেলেদের কাছে বলতে গিয়েও সুবিধে হয় নি।

তারা বলেছে, 'বুড়ো হয়ে মরতে চললে, এখনও বৌদের সঙ্গে গাছ-কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না তোমাদের! মরার

বয়স তো কবে পার হয়ে এসেছ, এখন কোথায় জপ-তপ পুজো-আহ্নিক করবে, ভগবানের নাম নিয়ে থাকবে—তা নয়, এখনও, সামান্য একটু খাওয়ার কমবেশী নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছ? ধন্য বটে। ভীমরতি না হ'লে এটা যে কত লজ্জার তা বুঝতে পারতে।

তাতেও চরম শিক্ষা হয় নি। ঝগড়া-ঝাঁটি করতে গেছেন (মামলার ভয়ও এক-আধবার দেখিয়েছেন বৈকি!) জবাবে অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। লবঙ্গ তো একদিন রাগ ক'রে বেরিয়েই গেল—সেই থেকেই সে বড় বা মেজমেয়ের বাড়িতে থাকে বেশির ভাগ। কদাচ কখনও ওঁর অসুখ কি শরীর খারাপ শুনলে এ বাড়ি আসে, দু-চারদিন থেকেই আবার সরে পড়ে। মেয়েদের ধারণা তাদের মায়ের হাতে দু-চার পয়সা আছে—সেটা একেবারে মিথ্যেও নয়; এখনও কিছু গহনা এবং দু-একখানা শেয়ার বা গভর্ণমেন্টের কাগজ আছে হাতে। তবে, ওরা যতটা ভাবে তত কিছু নেই। না থাক, সেই আশাতেই ওরা যত্ন করে। সেও ভাল, চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

কিন্তু তিনি কি করবেন! বুড়ো বয়সে ছেলেরা খেতে দেয় না বলে নাকে কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে উঠবেন? সে তাঁর দ্বারা হয়ে উঠবে না। চির স্বাধীন স্বভাব তাঁর, কর্তৃত্ব করা অভ্যাস। আরও এই স্বভাবের জন্যই ছেলেদের এত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। কিছুতেই ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেন না। এত দেখেও শিক্ষা হয় না তাঁর, আজও হ'ল না।

শেষে আজ চরম শিক্ষাই হয়ে গেল—ছেলেদের হাতে মার খাওয়া। এর আগে ধাক্কা-টাক্কা দু'চারটে খেয়েছেন। ঝগড়া করছেন বলে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে পুরে শেকল তুলে দিয়েছে—পাগলকে যেমন ক'রে সামলায় লোকে তেমনিই—আজ তো ছোট ছেলে মেরেই বসল সোজাসুজি। সেই ঘেন্নাতেই আর কখনও এ এ বাড়ি ঢুকবেন না বলে বেরিয়ে গিছলেন, মরার বা দেশান্তরী হয়ে যাওয়ার সংকল্প ক'রে।

॥ ১৫ ॥

জামাটা আলনায় রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ছিলেন মাধববাবু। বসে বসেই ভাবছিলেন এই জীবনটার কথা। নিজের অতীতকে এমন সমগ্রভাবে আদ্যন্ত অনেকদিন তাকিয়ে দেখেন নি। জীবনভর যে পাপ, যে অনাচার করেছেন—তা-ও এমনভাবে, এমন রূঢ় কর্কশ বাস্তব চেহারা নিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় নি। বিবেককে চিরকাল দাবিয়ে রেখেছিলেন, কখনও আমল দেন নি। ওগুলো কুসংস্কার বলে ভাবার চেষ্টা করেছেন—ভেবেছেন এ ধরনের চিন্তা কাপুরুষের দুর্বলতা।

ফলে বিবেক বস্তুটাই তাঁর মনের দৃশ্যমান জগত থেকে যেন মুছে গিয়েছিল। তবে তা মরে নি, একেবারে বোধহয় মরেও না। আজ এতকাল পরে—চরম আঘাতে দুঃসহ অপমানে সেই বিবেকই যেন চেতনার বিস্মৃত কোন্ অন্ধকার কোণ থেকে শেষা-শীতের নবজাগ্রত সরীসৃপের মতো ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মাথা তুলতে লাগল। সামান্য একটু দংশনও অনুভব করলেন যেন।

এই কি তাহ'লে পাপের শাস্তি? ঈশ্বরের ন্যায়বিচার?

অমোঘ বিধান। নির্মম, অব্যর্থ?…

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলেন মাধববাবু। যা কখনও করেন নি তা আজ আর নতুন ক'রে করতে গিয়ে লাভ নেই। অনেক, অনেক জমা হয়ে আছে, জীবনের ঋণের খাতায়। আশি বছর পেরিয়ে এসে আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। নতুন পথে চলবার সময় নেই আর। ভুল—যদি ভুলই থাকে—সংশোধনের আর সময় নেই। অকারণ সে ন্যাকামির নাটক রচনা করতে চান না এখন আর, এই বয়সে।

আর, দরকারই বা কি! এতকাল যে পথে যেভাবে চলে এসেছেন—বাকী হয়ত দুটো কি একটা বছর সেই পথে সেই ভাবেই

চলতে হবে। এখন কি আর নতুন কথা ভাবতে, জীবন সম্বন্ধে নতুন ক'রে ধারণা করতে পারবেন ?

মন দৃঢ় ক'রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বলতাটা যেন অনেক কেটে গেল। মন তার অভ্যস্ত পথেই চিন্তা শুরু করল আবার। জ্বালা এখনও কিছুমাত্র কমে নি—অতীত জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে বর্তমানে পৌঁছে বরং বেড়েছে যেন।

ঐ হারামজাদাকে—হারামজাদাদের জব্দ করতেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

বাপ-মায়েই ছেলেদের সৎশিক্ষা দেয়, হয়ত তিনি তা পারেন নি। পারেন নি সময় হয় নি বলে। অথবা সে পদ্ধতি জানতেন না। তবু একেবারে কি কিছুই দেন নি ? আর সে যা হবার তা তো হয়েই গেছে এখন। শুধু মরবার আগে শেষ শিক্ষাটা দিয়ে যেতে চান। এমন শিক্ষা—যা ওরা বাকী জীবনে না ভোলে।···

অনেক টাকা চাইছে যে ছোঁড়াটা। চার-পাঁচশো। কোথায় পাবেন অত টাকা! থাকলে তিনি এই মুহূর্তে খরচ করতে দ্বিধা করতেন না।···অন্য কোন জিনিসও যদি থাকত—বেচে ঐ ছোঁড়াটার হাতে দিতেন। এক এই সব জিনিস, খাটবিছানা আলমারি বেচা যায় বটে কিন্তু সে তো আর চুপি চুপি হয় না, একদিনেও হয় না। সে বড্ড লোক-জানাজানি— শোরগোল, বিস্তর কৈফিয়ৎ, অসংখ্য 'কেন'র জবাব দেওয়া।

ভাবতে ভাবতে আবারও নিজের অসহায়তায় চোখে জল এলো মাধববাবুর। এইভাবেই কি পড়ে মার খাবেন! এই বুড়ো বয়সে মুখ বুজে এই দুর্গতি সহ্য করতে হবে—চিরকাল সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে এসে ?

অথবা কি সেইজন্যই ভাগ্যের এই মার ওঁর ওপর ?

এই তাঁর প্রাপ্য ছিল।···

না না। ওসব কথা এখনই ভাবতে বসবেন না।

এখনও তো সম্পূর্ণ পরনির্ভর হন নি। পক্ষাঘাত হ্য়ে পড়ে তো নেই। এখনও এ হাড়ে ভেল্‌কি খেলাতে পারেন হয়ত। অন্তত আশা রাখতে দোষ কি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

যতক্ষণ একটুও ক্ষমতা আছে—পড়ে মার খাবেন না। প্রতিশোধের কথাই ভাববেন। চরম শিক্ষা দেওয়ার কথাটাই।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবেই বিছানার দিকে দৃষ্টিটা পড়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টি স্মৃতিতীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

শুধু চোখ নয়—হঠাৎ, বুঝিবা ভগবানের ইঙ্গিতেই, মনের দৃষ্টিটাও খুলে গেল।

বাজারের কেনা নয়। এ-খাট তাঁর বাড়িতে তৈরী করানো। চীনে মিস্ত্রী ডেকে খাট করিয়েছিলেন। সেই সময়ই তাদের দিয়ে খাটের মাথার দিকের মোটা ফ্রেমটার মধ্যে ছুটো 'লকার' করিয়ে নিয়েছিলেন গোপনে। এমনভাবেই মিলিয়ে দিয়েছিল বেটারা যে, খুব সাফ নজর না হ'লে সেটার অস্তিত্ব চোখে পড়বে না কারও। চাবির মুখটার ওপর পাতলা কাঠের চাপা—লতাপাতা কারুকার্যের সঙ্গে মিলানো—চট্ ক'রে বোঝা যায় না।

খুব বড় একটা কিছু নয়। কিন্তু মহামূল্য জিনিস রাখার পক্ষে যথেষ্ট। কেউ এর সন্ধান রাখে না। জানার মধ্যে জানে এক লবঙ্গ, তা-ও ওর খোলার কৌশল তারও জানা নেই।

এটা করেছিলেন অনেক আশা নিয়ে। ভেবেছিলেন সোনার কারবারে যখন লাখ লাখ টাকা হবে তখন শুধু দামী হীরে আর পান্না কিনে ভরিয়ে রাখবেন এই লকার, অল্পভার বহুমূল্য পাথরে। সে গুড়ে বালি পড়েছে। এটাই বোধ হয় অপয়া—কিছু রাখার সম্ভাবনা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর কিছুই প্রায় নেই, সেইজন্যে দীর্ঘকাল খোলাও হয় নি। ওর অস্তিত্বটাই মনে ছিল না।

অকস্মাৎ আজ মনে পড়ল। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল—এখনও একটা জিনিস ওর মধ্যে পড়ে আছে—সোনার হার এক ছড়া। ঘষা-গোট হার—দু' ভরির ওপর। এখনকার সোনার যা দাম, পানমরা গালাই প্রভৃতি বাদ দিলেও হাজার টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু স্যাকরারা যা! নইলে—জিনিসটা একেবারেই নতুন—কেউ কোনদিন ব্যবহার করে নি। এখনও রসান ওঠে নি। কোন ময়লা-গালাই কি পানমরা বাদ দেবার প্রশ্নই নেই—কিন্তু স্যাকরারা কি শুনবে? ঐ সব ছিষ্টির অজুহাত দেখিয়ে ভরিকরা পঞ্চাশ-ষাট টাকা কেটে নেবে!

কেউ ব্যবহার করে নি, মানে যার জন্যে গড়ানো- তাকে দেওয়াই হয় নি।

আসল কথা, তাঁরও একটি—তাঁদের সেকালের ভাষায় 'জলপাত্র' ছিল। সরমা ঝি, অল্পবয়সী, স্বামী পরিত্যক্তা—ঠিকে-ঝিয়ের কাজে লেগেছিল, একটি ছোট ছেলে নিয়ে। তাঁদের বাড়িও কাজ করত—বাসনমাজা ঘরমোছার কাজ। একবেলা খেত দু'জনে, মাইনে বিশেষ দিতেন না।

তাই বলে প্রথম থেকেই কোন ঘনিষ্ঠতা হয় নি। বছর কতক কাজ করার পর হঠাৎ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ল মেয়েটা। ছেলেটা তখন ওরই মধ্যে একটু মাথা-চাড়া দিয়েছে—পাখনা গজিয়েছে তার, সে বেগতিক দেখে খড়্গাপুরের দিকে কোথায় পালিয়ে গিয়ে এক মোটরগাড়ির কারখানায় পাঁচসিকে না দেড় টাকা রোজে কাজে লেগে গেল। আসলে খারাপ দলে পড়ে গিছল। নেশাভাঙের অব্যেস হয়ে গিছল—তার পয়সা যোগাতে কাজ করা ছাড়া গতি নেই। সেই দলের সঙ্গেই ওখানে চলে গিয়ে কাজে লেগেছিল।

এদিকে মেয়েটা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ল—অথর্ব, পঙ্গু। কেমন মায়া বোধ হ'ল মাধববাবুর। তিনি পাড়ার ডাক্তারকে দেখতে পাঠালেন। গোটা দশেক টাকা তাঁর হাতেই দিয়ে বলে দিলেন—ওষুধপত্র যা-যা দেবার সব তিনিই যেন দেন, অবশ্য রয়ে-বসে, খুব

দামী ওষুধ কি লম্বা ফর্দ দিলে পেরে উঠবেন না তিনি খরচ টানতে। আর অমনি সরমার বাড়িওলার হাতেও গোটা পাঁচ-ছয় টাকা দিয়ে বলে দিলেন, দু'বেলার খাবারটা—ভাত বা রুটি—ওরাই যেন ক'রে দেয়, খরচ যা লাগবে উনিই দেবেন।

সেই শুরু হ'ল যাওয়া-আসা। মাস-দুই পড়ে ছিল সরমা। মাটির ঘর মাটির মেঝে—মাধববাবুই তক্তপোশ কিনে দিলেন। ভদ্দর-লোকের মতো একটু বিছানার ব্যবস্থাও। তার কিছু সঞ্চয় থাকার কথা নয়, ছিলও না। সব খরচই মাধববাবুকে টানতে হয়েছে। খুব কমও নয়—সব জড়িয়ে দু' মাসে প্রায় সওয়াশো টাকার মতো। এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল তা তিনিও জানেন না. শান্ত স্বভাবের হাসিমুখ মেয়েটাকে তাঁর প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিল, তবে সেটার যে অন্য আকর্ষণ থাকতে পারে, অন্য অর্থ হ'তে পারে সে ভাল লাগার—তা তাঁর মনে হয় নি তখন।

মনে হয় নি তার দুটো কারণ। প্রথমত, এই শ্রেণীর দৈহিক ভোগ-সুখের জন্যে কখনও একটি পয়সা খরচ করেন নি, করতে হয় নি। আপনিই যা এসেছে, মাগ্‌না—তাতেই চলে গেছে তাঁর। দ্বিতীয়ত, এই সময়টায় তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তখনও যে কোন মেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে পারে—তা ধারণাও করতে পারেন নি প্রথমটায়।

যাওয়া-আসা শুরু হ'ল, থামল না। গোড়ায় যেতেন অসুখ উপলক্ষে, পরে অভ্যাসবশত। ভাল লাগত—এই পর্যন্ত। অনেক রাত্রে কলকাতা থেকে ফেরার পথে একবার এসে বসতেন। সেজন্যে ভাল ফরসা চাদর-বালিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ সরমা খুবই করত—সেবাযত্ন। গা-হাত-পা টিপে দিত, তেল গরম ক'রে পায়ে মালিশ করত, হ্যারিকেনের মৃদু আলোতেই নখ কেটে দিত। গল্প করত—তার সংকীর্ণ জগতের মধ্যেকার সুখ-দুঃখের গল্প—চা ক'রে খাওয়াত।

এই অবধিই। এর বেশী কদাচিত কখনও। মনে হয় তিনি তত নন—সরমাই তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। সত্যিকারের

ভালবাসা। সে ভালবাসার চেহারা মাধববাবু জানেন, তার মধ্যে কোন ভেজাল বা লোভ ছিল না—এ তিনি হলফ ক'রে বলতে পারেন। খুব শান্তি পেতেন তিনি এই সময়টুকুতে। এত শান্তি দীর্ঘকাল পান নি। লবঙ্গও ভালবাসত, ভালবাসে—কিন্তু সে তো কতকটা যেন নিয়মমাফিক, সে একটা বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন, কোনদিন কেউ যাচাই করার চেষ্টাও তো করেন নি। তাছাড়া আসলের চেয়ে উপরিতে আনন্দ ও তৃপ্তি বেশী। সেই আনন্দই পেতেন তিনি—আশার অতিরিক্ত—ঐ কৈবর্ত মেয়েটার সাহচর্যে।

দীর্ঘকাল কিছুই দেন নি সরমাকে, সে-ও কখনও কিছু চায় নি। দেওয়ার মধ্যে কাপড়টা-জামাটা—সে কিছুই নয়। পূজোয় তো বাড়ি থেকেই দেওয়া হ'ত। কখনও-সখনও খুব অভাবে পড়েছে দেখলে উনি নিজেই সেটা বুঝে উপযাচক হয়ে দিতেন—দু-পাঁচটা টাকা কিম্বা এটা-ওটা জিনিসপত্র।

জানাজানি হয়ে গিছল বৈকি। যেখানে নিত্য—প্রায় নিয়মিত যাওয়া-আসার ব্যাপার, সেখানে কথাটা চাপা থাকবে তা সম্ভব নয়। ছেলেরা এ নিয়ে প্রথম প্রথম খুব রাগারাগি করেছে—বৌরা টিপ্পনি কেটেছে, শুনিয়ে শুনিয়ে ধিক্কার দিয়েছে। কেবল লবঙ্গই কিছু বলেন নি। বলেন নি মানে অনুযোগ করেন নি। বরং বলেছেন, 'ভাল হয়েছে, আমি রেহাই পেয়েছি। এ সুমতিটা কিছুদিন আগে হ'লে ভাল হ'ত।'

অবশ্য আরও দু' একজন মাঝে মাঝে কখনও কখনও সরমার ঘরে এসেছে। মাধববাবুরও তা চোখ এড়ায় নি। তবে তা নিয়ে মাথাও ঘামান নি তিনি। কলহকেজিয়া তো করেনই নি। এ তো আর ঠিক উগ্র ভালবাসার সম্পর্ক নয়—পয়সা দিয়ে বাঁধা মেয়েমানুষ রাখাও নয়। অল্প বয়স ওর, এ-সব উপসর্গ থাকবে বৈকি। তাঁর সেবাযত্নে তো কোন ত্রুটি করে নি; সে সেবার মধ্যে কোনদিন আন্তরিকতার অভাবও দেখেন নি। সেক্ষেত্রে—আরও বেশী খবর

রাখতে কি পাহারা দিতে গিয়ে দরকারটা কি? মিছিমিছি অশান্তি ডেকে আনা।

এর মধ্যে সেই পালিয়ে-যাওয়া স্বামীও ফিরে এসেছে সরমার। সে-ও লুকিয়ে চুরিয়ে আসত এক-আধদিন। অঘোর নাম লোকটার— আর এক জায়গায় গিয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘর করছিল। গোটা কতক ছেলেমেয়ে হয়ে যেতে আবার তাকে ফেলে এ-পাড়াতেই এসে বাসা বেঁধেছে। বোধ হয় ইচ্ছে ছিল এখানেই নোঙর ফেলে— মাধববাবুর প্রচণ্ড ধমকে ও পুলিসে দেওয়ার ভয় দেখানোতে সে ইচ্ছে লোপ পেয়েছে। অতটা অন্তরঙ্গতা করতে আর সাহসে কুলোয় নি। তবে এক-আধদিন এসে রাত কাটিয়ে গেছে এটা জানতেন উনি, অত আর কড়াকড়ি করতে যান নি। মাধববাবুর বিশ্বাস এই রেবা মেয়েটা সেই অঘোরেরই সন্তান—বাইরে সরমাও তাই বলত, যদিচ ওঁর কাছে দাবি করেছে ওঁরই মেয়ে সে। চেহারার দু' একটা লক্ষণও মিলিয়ে দিয়েছে। নইলে এত সুন্দর দেখতে হবে কেন—যুক্তিও দিয়েছে। অঘোর তো ভূতের মতো কালো, তেমনি থ্যাবড়া মুখ আর গোলগোল চোখ।

কে জানে, মাধববাবু অত মাথা ঘামান নি কখনও। ভরণপোষণ বা বিয়ের দায় কোনদিনই বইতে হবে না তাঁকে। আইনত কেউ কিছু দাবি করতে পারবে না। সরমা বলেছে অঘোরের মেয়ে। অঘোরও কোনদিন সে কথার প্রতিবাদ করে নি। চুকে গেছে ল্যাঠা।...

॥ ১৬ ॥

বহুদিন পরে হঠাৎই কথাটা বলে ফেলেছিল সরমা।

তাঁর কাছে চায় নি, সে কথা মনেও হয় নি বোধ হয়। তিনি যে দিতে পারেন তা-ও ভাবে নি। এমনিই, প্রসঙ্গত বলেছিল।

তার একটা সোনার হার পরবার নাকি খুব শখ। অনেকদিনের শখ এটা। কখনই হয়ে ওঠে নি। সেজন্যে নাকি কষ্ট ক'রে ক'রে যতবার টাকা জমিয়েছে একটু—ততবারই একটা না একটা ব্যাপারে তা বেরিয়ে গেছে। সোনার দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে হু হু ক'রে—তাতে সে শখ কোনদিনই মিটবে না, এই কথাই বলেছে সে সেই সঙ্গেই। এদিকেও তো খরচপত্র দিন দিন বাড়ছে—সে অনুপাতে আয় তো আর তেমন বাড়ছে না। টাকা জমা দূরের কথা—বাবু কিছু কিছু না দিলে তো খেতেই পেত না।

মাধববাবুও কথাটা চুপ ক'রে শুনে গেছেন বিড়ি খেতে খেতে—কোন মন্তব্য করেন নি। তিনি যে মনে মনে এটা 'টুকে' রাখলেন—তা-ও জানতে দেন নি। তখন সেই টাল-মাটাল যাচ্ছে, মোকদ্দমা—আয় বন্ধ হয়েছে, খরচ হচ্ছে হু-হু ক'রে। তখন এ-সব কথা ভাবার অবস্থাও নয়।

সেই সময়ই অকস্মাৎ আবার অসুখে পড়ল সরমা। নানা রকমের জটিল উপসর্গ সব। ডাক্তারে সন্দেহ করলেন ক্যান্সার। হাসপাতালে দেবার চেষ্টা করবেন সে অবসর ওঁর ছিল না, ফলে সামান্য যেটুকু যা হয় পাড়ার ডাক্তারের দ্বারা, তা-ই হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে উনি তাকে পাঁচ দশ টাকা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে রেবাকেও। রেবা অবশ্যি তখন পুরনো বাড়িগুলোর কাজ বজায় দিতে শুরু করেছে। তবু তাতে তো কুলোয় না।

কিন্তু একটা কথা তখনও মনে ছিল—হারটার কথা।

মরার আগে এই সাধটা ওর মিটিয়ে দেওয়া উচিত। ওর কাছ থেকে অনেক পেয়েছেন তিনি, এটুকু না দিলে অন্যায় হবে। আর যেখানে প্রত্যহ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে প্রায়, সেখানে পাঁচ-ছ'শোতে কি এসে যাবে? এই ভেবেই স্যাকরাকে একটু সোনা দিয়ে বলেছিলেন, হারটা চুপিচুপি তাঁর হাতেই দিতে। সোনা বেশি দিতে পারেন নি—প্রথমত ক'দিনই বা ওর ভোগে হবে এটা, অনর্থক সোনাটাই নষ্ট দ্বিতীয়ত যদিই বা বেঁচে ওঠে, মেয়েছেলের ব্যাপার,

ক হয়ত ভোগা দিয়ে নেবে। অবশ্য যে হার গড়াতে দিয়েছেন তা ঐ সোনাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। লবঙ্গের গলায় বারো মাস ঘষা-গোট থাকে এক ছড়া। বেশ নাকি ঝিকঝিক করে—সরমা ওঁকে বলেছিল অনেকদিন আগে—সেই প্যাটার্নেই করতে দিয়েছিলেন তাই।

কিন্তু যার অদৃষ্টে ভোগ নেই তাকে কেউ ভোগ করাতে পারে না। সে হার আর তার পরা হ'ল না। যেদিন স্যাকরা গড়িয়ে দিয়ে গেল --সেই দিনই সকাল থেকে শ্বাস উঠল সরমার। সন্ধ্যার আগেই মারা গেল।

তারপর বহুকাল পড়ে ছিল। মনেও ছিল না আর হারটার কথা। এই গতবার বাড়ি মেরামতের সময় শেষ ধূলি-গুঁড়ি যা অবশিষ্ট আছে ঝেড়েমুছে বার করতে গিয়ে এটা চোখে পড়েছিল। তবু বার ক'রেও রেখে দিয়েছিলেন আবার, বেচতে মন সরে নি। মনে হয়েছিল এটা রেবারই প্রাপ্য, তাকেই দেবেন। যদি ওঁর না-ও হয় -সরমার মেয়ে তো, রেবারই পাওয়া উচিত।

এই ভেবেই একদিন রাত্রে হারটা পকেটে ক'রে বেরিয়েছিলেন উনি। অনেকদিন পরে ঐ সময়—ঐ পথে। রেবা সেই ঘরেই থাকে এখনও। ওর মা একটা বিয়েও দিয়েছিল, বছর বারো বয়সে, সে বিয়ে ধোপে টেকে নি। যেমন হয়ে থাকে ওদের ঘরে, দু-চার টাকা হাতিয়ে সরে পড়েছে। ভাগো আবার একটা ল্যাংবোট রেখে যায় নি পিছনে। একাই থাকে এখন। রাত্রে নাকি বাড়িওলার একটা মেয়ে এসে শোয়। অন্তত: ওঁকে তাই বলছিল রেবা।

অঘোরও আর একটা সংসার পেতেছে ও-পাড়াতেই। তারও একটা বাচ্চা ছেলে এসে থাকে মধ্যে মধ্যে। অঘোর দিনের বেলা হাটবাজার ক'রে দেয়। অঘোরকে অনেকবার বলেছেন উনি ওর আর একটা বিয়ের চেষ্টা দেখতে, এক-আধশো টাকা যেমন ক'রেই

হোক যোগাড় ক'রে দেবেন—এমন আভাসও দিয়েছেন। সে-ও সেটা দেখছে—এই রকম সময়ের ঘটনা সেটা।

উনি হার নিয়ে বেরিয়ে ওর ঘরের কাছাকাছি গিয়ে দেখেছেন দোর বন্ধ। ঘরে আলো জ্বলছে, সেটা দরজার ফুটো দিয়ে দেখা যায়। তখন রাত সাড়ে ন'টা—শুয়ে পড়ার কথাও নয়, হয়ত রান্না শেষ করেছে, খাওয়া-দাওয়া করছে—দরজা ভেজিয়ে, এই ভেবেই শেকল না নেড়ে দরজাটা ঠেলেছেন। কিন্তু খুলে যা দেখেছেন তার পর আর দাঁড়াতে পারেন নি। ওঁরই বড় নাতি—যে নাকি দেশের সেবা করবে বলে জীবন উৎসর্গ করেছে সাহসকুমার ওর বাবা নাম রেখেছেন শখ ক'রে—হাড়-বোকা ছোঁড়াটা; নইলে দরজাটায় খিল দেবার কথাও মনে পড়ে নি···

হার আর দেওয়া হয় নি। দিতে ইচ্ছেও হয় নি।

নিজের পথ নিজে দেখে নিয়েছে রেবা। বড় গাছে নৌকা বেঁধেছে, যা দেবার সে-ই দেবে। উনি আর মাঝখান থেকে ঘুষ দিতে যান কেন? দিতে গেলেও হয়ত কদর্থ হবে। ঐ নাতিই টিটকিরি দেবে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে বলে!

তখন তো দেবার কোন কথাই ছিল না, এখনও নেই। এই সেদিন খবর পেয়েছেন, উগ্র সাহেব পোদ্দারবাবু ওকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে তুলেছেন।

আপদ চুকেই গেছে।

আছে। হারটা এখনও লকারেই আছে···

ফেলে ছড়িয়েও হাজার টাকা! তা-ও না দেয় আটশো ন'শো টাকা তো পাওয়া যাবেই।

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো জ্বলে উঠল মাধববাবুর। অধীর আগ্রহে, ব্যাকুলতায়, প্রতিশোধ-সম্ভাবনার উগ্র উত্তেজনায় —হাত-পা কাঁপতে লাগল। বুকে সেইরকম ঢেঁকির পাড়। তা

হোক, আজই এর শেষ করবেন। এখনই এটা নিয়ে গিয়ে হারুকে দেবেন তিনি। বলবেন, এটা বেচে যা নেবার নে, বাকী যা থাকে —ধর্মে হয় দিবি, না হয় না দিবি। এখন কাজটা ক'রে দে যত শিগ্‌গির হয়। এমন মার দিবি যেন ছ-সাত মাস বিছানায় পড়ে থাকে হারামজাদারা—। ওঁকে তার ফলে ভিক্ষে ক'রে খেতে হয় —সেও ভি আচ্ছা!

লকারের চাবি থাকে তাঁর কোমরের ঘুন্‌সিতে। বস্তুত এই চাবির জন্যেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত ঘুন্‌সি পরেন তিনি। কোথাও রেখে বিশ্বাস হয় না।

সাবধানে সন্তর্পণে চাবিটা বার ক'রে নিয়ে—আস্তে আস্তে বিছানা সরাতে শুরু করলেন। ভারি ভারি বালিশ, তুলতে কষ্ট হয়, কিন্তু উপায়ও নেই। সব বালিশ সরিয়ে, তোশক লেপ খানিকটা গুটিয়ে ফেললে তবে তালার মুখটা পাওয়া যাবে—আঙ্গুলে ক'রে ঢাকাটা সরানো—তার পরেও একহাতে গদিটা একটু উঁচু ক'রে না তুললে পাল্লা খুলবে না, হাত গলিয়ে মাল বার করা যাবে না।...

হারটা বার ক'রে আলোয় ধরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে দেখছেন—হঠাৎই যেন মনে হ'ল তিনি ছাড়া আরও কেউ দেখছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়ে গেল—ঘরের দরজাটা বন্ধ করেন নি তিনি এসে। এবং এ কাজ করার আগে সেটা বন্ধ করা খুব উচিত ছিল। কখনই তিনি, আজ পর্যন্ত, গভীর রাত্রেও —ঘরের দরজা বন্ধ না ক'রে এ লকার খোলেন নি।

সঙ্গে সঙ্গেই চেয়েছেন তিনি দরজার দিকে।...

একটা আর্তনাদ উঠতে গিয়েও গলায় আটকে গেল তাঁর।

শুধু চোখের ওপর এক ফুটোর খুপরি-কাটা কালো কাপড়ের মুখোশ পরা চার-পাঁচটা লোক—কি ছেলে—হাতে খাটো খাটো বন্দুক আর পিস্তলের মতো কী সব জিনিস, একেই বোধহয় স্টেন-গান বলে—নলগুলো তাঁর দিকেই উঁচিয়ে ধরা—

ভয় ও হতাশা; ক্ষোভ এবং আত্মধিক্কার; অনুশোচনা—সব মিলিয়ে স্বর বন্ধ হয়ে গেল মাধববাবুর। মনে হ'ল পায়ে একেবারেই কোন বল নেই, বুকের মধ্যেটাও নিদারুণ তোলপাড় করছে—নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে—

ওদের মধ্যেই কে একজন কৃত্রিম কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'দেখি দেখি।—ওটা! আর সিন্দুকের চাবিটা অমনি ঐ সঙ্গে—'

এইবার গলার আওয়াজ ফুটল মাধববাবুর।

আর্তকণ্ঠে শুধু 'না-না' বলে হারটা বুকে চেপে ধরতে গেলেন। এর কোন মানে হয় না, এভাবে পরিত্রাণ পাবেন না জেনেও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের লোকটা এগিয়ে এসে, তার হাতে যে নকল বন্দুকটা ধরা ছিল তারই নল দিয়ে ওঁর মাথায় মারল এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে গেলেন মাধববাবু, আর উঠলেন না।

ঐ ছেলেটা বা লোকটা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই কে একজন—ওদেরই মধ্যে থেকে চাপা গলায় বলে উঠেছিল, 'এই, মারিস না—!'

এ গলাটা উনি চিনতে পেরেছেন সেই শেষ মুহূর্তেও।

অম্বুজ, তাঁর নাতি। যার জন্যে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, দেহপাত করেছেন বলতে গেলে।

এই আঘাতটাই সামলানো সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। নইলে মাথার ও ঘা এমন কিছু মারাত্মক ছিল না।

॥ ১৭ ॥

অনেক ভেবে আর ঘুরে হারু লাইনের ধারটায় গিয়ে বসল। এইখানে লাইনে একটা বাঁক-মতো আছে। স্টেশনের আলোটা পুরো এসে পৌঁছয় না। তা ছাড়া কতকগুলো ঝোপঝাড়ও আছে এখানটায়—বড় কোন ছায়া সৃষ্টি না করলেও আড়ালের অবকাশ দেয়। স্টেশনের কাছে লাইনের ওপরটায় যে—খবরের কাগজের ভাষায়—'ভূমিহীন কৃষকদের' বস্তি হয়েছে, যাদের প্রধান কাজ

বেআইনী চাল এনে বিক্রী করা আর অবসর পেলে চুরি করা, মজুরের কাজ করতে চায় না কেউ ডবল তিনগুণ মজুরি না পেলে —সেটাও এখান থেকে একটু আগে এসে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এখানটায় এখনও নিরিবিলি ভাব বজায় আছে।

হারুর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে আজ। সকাল থেকেই দুর্দিন চলেছে। বেলা বারোটার পর থেকে কিছু খাওয়া হয় নি—কুকুরে ডন দিচ্ছে পেটে। উপরন্তু ঘোরাঘুরি ক'রেও ক্লান্ত, পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। জুতোটার গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে—তাই পরেই এতটা হাঁটা—সেই দুপুর থেকেই পায়ের ওপর আছে বলতে গেলে, বিকেলে ঘণ্টা-দেড়েক লেকের বেঞ্চিতে বসা ছাড়া - পাও ব্যথা করছে খুব, দস্তুরমতো খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। আর কিছু না হোক, কোথাও একটু বসা দরকার—খাওয়া না হয় না-ই হ'ল।

আসলে দোষ তারই। ওর এই বিশেষ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ যে খুব ভাল লাগে তা নয়—কোন কাজ নেই, একটা আড্ডা দরকার —এই হিসেবেই দলে ভিড়েছিল। প্রথম প্রথম খুব খারাপও লাগে নি। নোংরা কথা, নতুন নেশার একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু তারপর—নেশাটা যখন সিগারেট থেকে মদ এবং অন্য মাদকে পৌঁচেছে আর তার খরচ যোগাতে ক্রমশঃ তারা—দলের বাকী সবাই না হোক, পাণ্ডারা—চুরি রাহাজানির কথা ভাবতে শুরু করেছে তখনই একটা অস্বস্তি-ভাব এসেছে মনে। মিশতেও পারে নি, ছাড়তেও পারে নি এদের দল। ছাড়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু কর্মহীন বিপুল অবসর একদিক থেকে তাড়া করেছে ওকে, আর একদিক থেকে ওদের হুমকি ও ধমক, অভিভাবকদের কাছে অপদস্থ করার ভয়—ওকে বাধ্য করেছে দলে ফিরে আসতে।

আসলে ও ভীতু। আজ সেটা পরিষ্কার বুঝেছে। ভীতু বলেই এত কাণ্ড, এই কষ্ট। ভীতু বলেই ওদের কথামতো কল চুরি করতে বেরোতে পারে নি, ভীতু বলেই সারাদিন ওদের কাছে জবাবদিহি

করার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর আকাশপাতাল ভাবছে কি ক'রে ওদের সঙ্গ পরিহার করবে।

সত্যিই আর হারুর ভাল লাগছে না এই সব। এই একঘেয়ে ইয়ার্কি, কটা পয়সা যোগাড় করার জন্যে অহর্নিশি এক ধরনের আলোচনা, জল্পনা কল্পনা—আর এই একঘেয়ে বেকার জীবন। তবে এটাও ঠিক—এই সেদিন পর্যন্ত, সেদিন কেন, কাল রাত্রি পর্যন্ত—এদের সাহচর্য এই বাজে ইয়ার্কি এতটা খারাপ লাগে নি, এত অসহ্য বোধ হয় নি যতটা আজ হচ্ছে। হয় নি তার কারণ এমনভাবে এদের দিকে, নিজের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে নি এর আগে, আজকের আগে। আজ যেন, মনে মনে অন্ততঃ, এই জীবন, এই পাড়া থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে। দূর থেকে দেখছে বলেই অনেক দূর দেখতে পাচ্ছে সে, সমগ্রভাবে তার পরিচিত জগৎটাকে দেখছে—আজন্ম দেখা এই লোকগুলো, তার বাড়ি, সংসার—তাদের জীবনধারা।

দেখেছে বৈকি, সবাইকেই দেখেছে, দেখেছে সবই। কিন্তু এমনভাবে দেখে নি। এমন ওদের মনের, ওদের জীবনযাত্রার ভেতরটা পর্যন্ত। দেখে নি মানে দেখার চেষ্টা করে নি, দেখার কথা ভাবেও নি। আজ ঘৃণায় আর ধিক্কারে গলার কাছ পর্যন্ত তেতো হয়ে গেছে বলেই এতদূর চোখ গিয়ে পৌঁচেছে।

সবাই সমান। এরা, তারা, সবাই। তাদের পূর্ব পুরুষ, তাদের ডবল বয়সের লোক, তার বাবা মা, মার পেয়ারের ঐ নিমুদা,—যে কেন প্রত্যহ তাদের বাড়িতে আসে আর রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসে থাকে, যার জন্যে বাবাকে অত রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকতে হয়, (আর ঘর নেই তাদের বাড়ি বলে), কিসের টানে, কোন্ আকর্ষণে—নিজের থেকে বয়সে বড় সাধারণ চেহারার একটা মেয়েছেলের কাছে, যার জন্যে ঘরে বাইরে নিন্দাকটূক্তির ছিছিক্কারের শেষ নেই, অনেকদিন পর্যন্ত তা বুঝতে না পারলেও—এখন যেন পারে। ওরাও যেমন—ওদের পরবর্তী

বয়সের লোক, ওদের ছেলের বয়িসী সে আর তার বন্ধুরা, সকলেই তেমনি। হারুর আজই ঘুরতে ঘুরতে উপমাটা মনে পড়ল, একটা পচা এঁদো পুকুরে যেন কতকগুলো ব্যাঙ কিলবিল করছে। ঐ পুকুরেরই পাঁক, পোকামাকড়, চারা মাছ আর ময়লা—এর বাইরে কোন কিছুই জানে না তারা, কিছু দেখে নি, দেখার ইচ্ছেও নেই।

ঐ যে অবুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে এল কিছুক্ষণ আগে, পালিয়ে এল বলতে গেলে—ওদের পরিবারটাই ধরো না। সম্ভ্রান্ত বংশ নাকি, জাতে বদ্যি হ'লেও অবুর এক ঠাকুর্দা সন্ন্যাসী হয়েছিল, শোনা যায় দশহাজারের ওপর শিষ্য তার। ঢাকা জেলার কোথায় আশ্রম ছিল, ঢালাও মোচ্ছব চলত সেখানে প্রতিদিন শিষ্যদের পয়সায়। পাকিস্তান হবার পরও তিনি বেঁচে ছিলেন, পালিয়ে কাশীতে গিয়ে বাস করছিলেন. এই ক' মাস আগে ক্যান্সারে মারা গেছেন।

অবুর আপন ঠাকুর্দা সেকালের এম. এ. পাস—ফরিদপুরের কাছে কোথায় যেন হেডমাস্টারী করতেন, পাকিস্তান হবার আগেই এখানে চলে এসেছিলেন। ওর বাবাও বি. এ. পাস নাকি, ভাল চাকরিও করতেন—তুর্বুদ্ধিতে নষ্ট হয়ে গেলেন। প্রথমে ঘোড়দৌড় পরে মদ, এই তুইয়ের টানে আপিসের টাকা তছরূপ ক'রে চাকরি যায়, সেই থেকে এটা-ওটা কিছু রোজগারের চেষ্টা করেন কখনও কখনও তু'চার পয়সা আসেও—কিন্তু কিছু হাতে পেলেই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেন সব। দিনরাত চুর হয়ে থাকেন সেই সময়টায়। অনেক ছেলেমেয়ে—একজনও লেখাপড়া শেখে নি। ঠাকুর্দা শেষের দিকে ছেলের জন্যে পাড়ায় বেরুনোই বন্ধ করেছিলেন মুখ দেখাতে লজ্জা করত তাঁর। যাহোক তিনি তবু ম'রে বেঁচেছেন। ঠাকুমা এখনও আছেন, তুর্গতির শেষ নেই তাঁর। নেহাৎ এক কাকা আছেন, ভাল রোজগার করেন—ভাইপো-ভাইঝিদের জন্যে যত না হোক, বড় ভাজের জন্যেই আরও—বৌদি ছোটবেলায় এসেছিল

এ বাড়িতে, সমবয়সী, বন্ধুর মতোই বেড়ে উঠেছেন, খেলাধুলো ঝগড়া মারামারি করেছেন—সেই বৌদির টানেই সংসারটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি, নিজের স্ত্রীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেন, লজ্জা নিবারণের জন্যে জামাকাপড়ও—তার বেশি এক পয়সাও না। ফলে নেশা আর সিনেমার খরচ জোটাতে—সে জন্যে চক্রান্ত আর মন্ত্রণা করতেই—অবু আর তার ভাইদের সারা দিন কেটে যায় ; জীবিকা বা ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটা ভাবার সময় পায় না।

অবু কেন শুধু—ফুচুন, বাদল ও নন্তু -কারুরই এক পয়সা আয় নেই। অবস্থা বরং হারুর চেয়েও খারাপ। হারু তবু মা-বাবার একমাত্র সন্তান, বাবা একেবারে দীনদুঃখীও নয় - হারুর বিশ্বাস কৃপণ বলেই ঐ ভাবে থাকে বাপটা—তাছাড়া নিমুদা আছে, ভাল ভাল জামা-কাপড়ের দুঃখ নেই তার নিমুদার কল্যাণে। আরও আছে। ভাড়াটেদের বৌ আশা আছে। সিগারেট আর সিনেমার খরচটা যুগিয়ে যায় এক রকম, জিনিস কিনতে দেবার নাম ক'রে এক টাকার সঙ্গে লুকিয়ে আরও এক টাকার নোট গুঁজে দেয় হাতে, কখনও বা আট আনা চার আনা পয়সা। তার বেশী সঙ্গতি নেই আশার—হারু তা ভাল ক'রেই জানে। এটুকুও যে দেয় মাসে তিন-চার টাকার বেশী তো কম নয় - নিজের স্বামী আর ছেলেকে, নিজেকে বঞ্চিত ক'রেই।

এদের কেউই নেই এমন, কিছুই নেই। বাদলের দাদা আছে, সংসারটা টানে। খাওয়া পরা চলে যায়। কিন্তু দাদা বিয়ে করেছে, বাচ্চা হয়েছে একটি, ভাইয়ের নেশার খরচ যোগানো সম্ভব নয় এই বাজারে। সংসারের টাকা বৌদির হাতে—মা যে দেবেন লুকিয়ে চুরিয়ে সে উপায়ও নেই। কখনও সখনও দু' আনা চার আনা—তাতে বিড়ি-সিগারেটের খরচাটাও পুরো চলে না। অথচ বাবুরা নেশাতে ডবল প্রমোশন পেয়ে বসে আছেন - চুরি ছাড়া সে রাজনেশার খরচ চালানো যায় না।

ফুচুনের বাবা আছেন, ইস্কুলে মাস্টারী করতেন—এখন চাকরি নেই, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত টিউশ্যনি করেন—বি.-এ. পাস নয়, আগেকার আই.-এ. পাস, ভাল টিউশ্যনীও পান না—ছ'বেলা খাওয়া জোটাতে পারেন না।

এমনি সবাইকারই। এক নন্তুরই সম্প্রতি একটু অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু যেটুকু আয়ের পথ খুলেছে সেও তো ঐ খাওয়া-পরা—জীবন ধারণের মোটা খরচেই শেষ হয়ে যায়, বিলাসিতার কথা ভাবাও চলে না ওদের। ছ'খানা টিনের ঘর ভাড়া ক'রে থাকে নন্তুরা। ওর দাদা কোনমতে বি.-এ. টা পাস করেছিল, তারই মাথাধরা হয়ে উঠে সংসার চালাবার কথা—চাকরি একটা পাবো-পাবোও হয়েছিল - হঠাৎ গিয়ে পড়ল, 'উগ্রপন্থী' যাকে বলে খবরের কাগজে, সেই দলে। সেও নাকি কোন্ এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। অত রাজনীতিফিতি তার আসত না, বুঝত না কিছু—বন্ধুর এক বোন ছিল, তার টানেই যেত বন্ধুর বাড়ি। মেয়েটা দেখতে ভাল ছিল, খেলোয়াড় মেয়ে এদের ভাষায়। কাজেই বন্ধু যে দলে খানিকটা সেই দলে গিয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল। অথচ এসবে তত রপ্ত নয়, মনও ছিল না--সেই জন্যেই চট্ ক'রে ধরা পড়ে গেল পুলিসে। সেও মায়ের জীবনান্ত, কোন্ এক প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি করেন ভদ্রমহিলা, তাঁর আর কত বা আয়—সম্পূর্ণ ধারদেনা ক'রে থানা-আদালতে ছুটোছুটি, বিভিন্ন স্থানে 'পুজো' চড়ানো—তার ফলে বছর খানেক পরে ছাড়া পেল বটে - কিন্তু থানার কর্তারা বললেন, 'ছেলেকে সরিয়ে দিন এখান থেকে, পশ্চিমবঙ্গে না থাকে কোথাও।' বোনের কাছ থেকে শ-ছুই টাকা নিয়ে সেই যে বোম্বে মেলে চেপেছে, নাগপুরের টিকিট কেটে—আজ পর্যন্ত আর তার কোন খবর পাওয়া যায় নি। নাগপুরে কে এক বন্ধু থাকত, সেই ভরসাতেই গিছল—কিন্তু সে বন্ধুর ঠিকানা সেও ভাল ক'রে জানত না, এদেরও জানিয়ে যেতে পারে নি। ফলে খবর নেওয়াও সম্ভব হয় নি।

নন্তুদের বাঁচিয়ে দিয়েছে ওর দিদিটাই।

বামুনের মেয়ে হয়ে এক সোনার-বেনে স্যাকরাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। বিয়েও নাকি করে নি শুনছে তো—বৌ বলে চালায় নিজেকে। সে লোকটা, বিদ্যুৎ নাম, তার নাকি আগের একটা বৌ আছে, ছেলেমেয়েও—ছোটবেলায় বিয়েকরা বৌ। সে আহিরীটোলায় পৈতৃক বাড়িতে থাকে, নন্তুর দিদি অসীমাকে বালিগঞ্জে আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে রেখেছে। ঝি, চাকর, বামুন নিয়ে রাজার হালে আছে সে।

নন্তুর ঐ বোনাইটা—বোনাই ছাড়া আর কি বলা যায় ওকে হারু তো ভেবে পায় না—পাজীর পা-ঝাড়া একেবারে। ওর জন্যে এর আগে এই পাড়াতেই একটা প্রাণ নষ্ট হয়েছে।...কে এক ভদ্রলোকেরা ভাড়া এসেছিলেন এখানে, কমলবাবুদের পেছনের টিনের বাড়িটায়। ভদ্রলোকের ছেলে ছিল না, তিনটি মেয়ে শুধু। তিনটিই সুন্দর দেখতে, লেখাপড়াও করে সবাই, বড়টা তখন বি.-এ. পাস ক'রে এম.-এ পড়ছিল, বাবা বিয়ের চেষ্টা দেখছেন—এমন সময় এই কাণ্ড।

ভদ্রলোক সাধারণ কি একটা দেশী ফার্মে কাজ করতেন, স্ত্রী ছিল না, তিনটি মেয়ে, এক বিধবা শালী—সে-ই সংসার দেখত, সেজন্যে তার একটা ছেলেকেও পুষতে হ'ত—অর্থাৎ ছ'টি প্রাণীর খাওয়া-পরা, লেখা-পড়া। সেই জন্যেই ঐ দোতলা বাড়ির পিছনে টিনের-চালা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, আর সেই জন্যেই খাওয়া-পরা চালিয়ে বাবুয়ানা করার খরচ যোগাতে পারতেন না।

ওদের মধ্যে মেজ মেয়েটা, নীলা নাম—সেইটেই সব চেয়ে সুন্দর দেখতে—বিদ্যুতের খপ্পরে পড়ে গেল। পড়ার কারণও ছিল। বিদ্যুতেরও চেহারা ভাল, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স নাকি, একদম বোঝা যায় না, দেখলে মনে হয় সাতাশ-আটাশ—লম্বা বলিষ্ঠ গঠন, চমৎকার মুখশ্রী, প্রায়-ফরসা রঙ, সুপুরুষই তাতে সন্দেহ নেই। তার ওপর পয়সা আছে। বালিগঞ্জে, নারকেলডাঙ্গায় দুটো গয়নার

দোকান, শখ হয়েছিল এখানেও একটা খুলবে। এখানের নীলমণি স্যাকরা দোকান বেচে দিল, সেই দোকানই কিনে এখানে এসে বসেছিল কিছুদিন, মোট বোধহয় আট-ন'মাস হবে। এটাও চলত, শোকেস এনে, তৈরী গয়না সাজিয়ে—সব নাকি আসল নয়, গিলটিই বেশির ভাগ; তা হোক, কে আর অত বুঝবে—তার ওপর জোর আলো দিয়ে সাজিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছিল। কাল হ'ল ঐ নীলা। কেলেঙ্কারি জানাজানি হবার পরই পাত্‌তাড়ি গুটোতে হ'ল, অন্তত: দোকানের পাট--নইলে মার খেয়ে মরত, হয়ত খুনই করত পাড়ার ছেলেরা।

সুন্দর চেহারা, অগাধ পয়সা—যখন তখন গয়না কাপড় উপহার দিতে পারে, দামী হোটেলে খাওয়াতে পারে, দামী টিকিট কেটে সিনেমা দেখায়-মেয়েরা শ্যামা-পোকার মতো এসে পড়ত, পুড়েও মরত!

নীলাও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিল। গহনা যে দিয়েছিল বাবা বা মাসী জানতে পারেন নি, পরে বেরোল ব্যাগ থেকে, ব্যাগে ক'রে নিয়ে গিয়ে পথে পরে নিত বোধহয়-- নেক্‌লেস, ব্রেসলেট, দামী বড় দুল। কলেজ যাবার নাম ক'রে বেরোত—কলেজ আর যেত না ইদানীং। কলেজের পর টিউটোরিয়াল বা কোচিং ক্লাস থাকে—সেই সময়টা বিদ্যুতের সঙ্গে সিনেমায় যেত। এক জায়গায় দেখা করত না, কোনদিন গড়িয়াহাটের মোড়ে, কোনদিন কোন চীনে রেস্তোরাঁর সামনে, কোনদিন বা সিনেমার গেটে-এ—আগে থাকতে বন্দোবস্ত থাকত—কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তিনটের শোতেই যেত বেশির ভাগ সিনেমা থেকে বেরিয়ে কোথায় কোন হোটেলে গিয়ে তুলত। সেখানে নাকি বিদ্যুতের ঘর ভাড়া করাই থাকত, হয়ত এখনও আছে। সাবধান নিশ্চয়ই হয়েছিল, সেসব সরঞ্জাম নাকি বিদ্যুতের পকেটে পকেটেই ঘোরে—তবু মেয়েটারই গেরো, কী করতে কি হয়ে গেল—মেয়েটা না পারলে কাউকে বলতে, না পারলে নিজে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে

—শেষে অন্য উপায় না দেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। পোস্টমর্টেমে অবস্থা ধরা পড়তে, ব্যাগ থেকে গয়না, তোরঙ্গের তলা থেকে দামী সিল্কের শাড়ি বেরোতে, আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না কারও—কারণ নীলার বাবা সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত আপিস করলেও, অনেকেই সিনেমায় যায়, পথে ঘাটে ঘোরে। দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে অনেকেই, নীলাকে সুবেশা সুসজ্জিতা অবস্থাতেই দেখেছে ; ঐ হোটেলেও দেখেছেন এখানের এক ডাক্তার, তাঁরও নাকি মধ্যে মধ্যে যেতে হয় সেখানে এক নার্সকে নিয়ে—সুতরাং দুই আর দুইয়ের যোগফলের মতোই এ অঙ্কটাও সহজে মিলে গেল।

নীলার বাবা লজ্জায় ঘেন্নায় সাত দিনের মধ্যেই এখান থেকে সোদপুর না খড়দায় কোথায় চলে গেলেন, বিদ্যুৎকেও দোকানে তালা বন্ধ করতে হ'ল ; বাধ্য হয়ে—ক'মাস পরে দোকানই তুলে দিতে হ'ল। গয়নার দোকানে কাঁচা পয়সা, নিজে না থাকলে চলে না।

নন্তুর দিদি অসীমাও বিদ্যুতের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল। শ্যামা-পোকার মতোই রূপ আর রূপোর আলোয় ছুটে গিয়েছিল সেও। তবে সে জাঁহাবাজ মেয়ে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, চট ক'রে ধরা দেয় নি, প্রজাপতির মতো চোখের সামনে নিজেকে মেলে তার খিদে বাড়িয়েছে। নীলার পালা শেষ হওয়ার দিকে এসেছিল সে, ততদিনে নীলাতে অরুচি ধরে এসেছে, আর নীলা ছিল ভালমানুষ—অসীমার মতো চোখে-মুখে বুদ্ধি আর ছলাকলার—হারুদের ভাষায় ছেনালির—ঝিলিক খেলে না। বিদ্যুৎই অসীমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, শ্যামা-পোকার ভূমিকা নিল সে-ই।

এখানে আসা বন্ধ হ'লেও দেখা হওয়া বন্ধ হয় নি। সেই সুযোগে অসীমা একটা বাড়ি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে

আগে। তারপর আলাদা বাসা করিয়ে, বিবাহের একটা অনুষ্ঠান মতো ক'রে, ভোজ দেবার নাম ক'রে বিস্তর লোক সাক্ষী রেখে—তবে ধরা দিয়েছে। এখন অসীমা ভয় দেখায়—কথায় কথায় বলে, 'এতগুলো লোক সাক্ষী, তুমি আগের বিয়ে ভাঁড়িয়ে আমাকে বিয়ে করেছ, এর পর একটু বেচাল দেখলেই নালিশ ক'রে জেল খাটাব তোমাকে!'

বিদ্যুৎ হয়ত তার জবাবে—আধা রসিকতার মতো ক'রে বলে—'তাতে তোমার বিয়েটাও অসিদ্ধ হয়ে যাবে, কোন লাভ হবে না তোমার।'

অসীমা ঠোঁট উল্‌টে মুক্তোর ঝালর দেওয়া তুলে আলোর লহর তুলে বলে, 'তাতে আমার বড় বয়েই যাবে। আমার যা আত্মীয়-স্বজন চেনা লোক, তাদের কাছে আমার পরিচয় বেরিয়ে-যাওয়া-মেয়ে—বেশ্যার সমান। তার চেয়ে বেশী আর কি হবে? বরং মামলাটা হ'লেই প্রেস্টিজ বাড়বে, সবাই বলবে, আহা, মেয়েটা তো বিশ্বাস ক'রে ভাল বুঝেই গিয়েছিল, ছোঁড়াটা যে এমন সাংঘাতিক জোচ্চোর, চিটিংবাজ—ও কেমন ক'রে জানবে বলো!'

সেই অসীমাই ওদের সংসার চালায়, নন্তুদের।

এখনও দুটো নাবালক ভাই-বোন আছে, নন্তু ছাড়াও। খরচ কম নয়, ওর মা মাস্টারী ক'রে পান মোটে দেড়শো টাকার মতো, সে ঘর ভাড়া ইলেকট্রিক আর ঘুঁটে-কয়লাতেই শেষ হয়ে যায়—বাকি সব টাকাটাই মেয়ের কাছে হাত পেতে নিতে হয়। আগে—নন্তুর এক কাকা কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তাতেই নন্তুর, ওর দাদার পড়াশুনো হয়েছে—তিনিও বছর দুই মারা গেছেন। মেয়ের কাছ থেকে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই। সেই জন্যেই, কতকটা নিজের লজ্জা ঢাকতেই বিদ্যুৎকে জামাই বলে পরিচয়ও দেন তিনি, লোক দেখিয়ে জামাইষষ্ঠীও করেন। নন্তু বলে, 'এ আমার দিদিরই চাল, বুঝলি না, আরও শক্ত পাক দিচ্ছে বাঁধনে—বাছাধনের যাতে ছাড়ান-ছিড়েন না থাকে!'

অবস্থা তো এই, সকলকারই। কেউ বা দাদার ভাতে খায়, কেউ বা কাকার ভাতে—কেউ বা বোন-বেচা পয়সায়। অথচ বাবুদের নেশার শখ আছে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। সে নেশার রসদ যোগাতে চুরি করা ছাড়া উপায় কি? নিজেরা তো করেই, দলের সব ছেলের ওপরই পীড়ন চালায়। সিঁদ কাটা ছাড়া সব চুরিই করে, করতে হয়। অবশ্য এমন কীই বা আছে—পথের আলোর বাল্‌ব্‌ আর রাস্তার কলের মুখ, এই-ই প্রধান ভরসা। কদাচিৎ কখনও নীলুর মতো বিভীষণ অন্য সুযোগ ক'রে দেয়। নীলু রাত্রে নিজেদের বৈঠকখানার দরজা খুলে রেখে বলেছিল, 'তোরা এসে ঘড়িটা নিয়ে যাস, সবাই ভাববে বাইরের চোর এসে তক্তপোশের তলায় লুকিয়ে ছিল, সে-ই নিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে গেছে।'

বাচ্চুর ভাগ্নে আশিসটা আবার তারেবাড়া। বাচ্চুর দাদা কতকগুলো পুরনো য়্যাসবেস্টাস শীট কিনে এনে রেখেছিল, রান্নাঘরের পুরনো চালাটা বদলে দেবে বলে। আশিস এসে খবর দিলে, 'আজ সবাই বে-বাড়ি নেমন্তন্ন যাবে বরানগরে, ফিরতে কোন্ না রাত বারোটা হবে, বিয়ের লগ্ন রাত দশটায়—তোরা পারিস তো খানকতক শীট সাফাই করিস। কোনমতে লাইনের ওপারে নিয়ে গিয়ে একটা ঠেলাগাড়িতে তুললেই হ'ল, যেখানেই গিয়ে দিবি—একশো টাকা বাঁধা।'

নীলুর কথা শুনে আর একবার কি কেলেঙ্কারিতে পড়েছিল ওরা। নীলু বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই করেছিল ওটা, কে জানে! বলেছিল, 'তোরা বাইরের ঘরে গিয়ে টোকা দিস, আমি দোর খুলে দোব।...সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত থাকব। আর কিছু নেই, পাখাটা নিস নি, তাহলে আর হবে না—চারটে বাল্‌ব্‌ আছে খুলে নিতে পারিস।'

হারু যায় নি—এসব ব্যাপারে সে থাকে না, বাবা রাত জেগে বসে থাকে এই অজুহাতে যতটা পারে এড়িয়ে যায়—নন্তু, বাদল

আর বিমু গিছল। তবে ওদের যেতে দেরি হয়েছিল একটু সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল—তাগ বুঝে বেরিয়ে, চৌকিদারের নজর এড়িয়ে ওখানে গিয়ে জড়ো হ'তে। অত রাত হয়েছে ভেবেই বোধ হয় নন্তু আর টোকা দেয় নি, হয়ত ভেবেছে এত রাত পর্যন্ত কি আর নীলু বসে থাকবে, নিশ্চয়ই দোর খুলে রেখে শুতে গেছে। কিন্তু দোর খুলতে নীলুর চাপা গলার আওয়াজ কিংবা নিস্তব্ধতা কোনটাই পাওয়া গেল না, তার বদলে একটা ঝটাপটি শব্দ, ভেতরের দিকের দোর খোলার চেষ্টা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ টিপে দিয়েছে বাদল—দেখে নীলুর বোন। আরও একজন অন্তত যে ছিল তা ওদিকের খোলা দোর, পর্দার প্রবল আন্দোলন এবং নীলার বিবর্ণ মুখেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

হারু একসময় অনন্যোপায় হয়েই এদের দলে মিশেছিল। লেখাপড়া যে তার হবে না, তা সেও জানত—অপরেও বুঝেছিল। কোনমতে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেছে—সেও এদেরই দয়াতে, সামান্য কিছু খরচ ক'রে 'তরে' গিয়েছিল। দেদার টোকার সুবিধে ক'রে দিয়েছিল এরা, নইলে পড়ে পাস করতে পারত না কোন দিনই।

তারপর থেকেই বেকার। শুধু শুধু ঘরে বসে থাকা যায় না চুপ ক'রে। আর বাইরে বেরোলে এই ধরনের বেকারের দলে মেশা ছাড়া উপায় কি? যারা ব্যস্ত, যারা রোজগার করে, যাদের জীবনের গতি চওড়া হোক সরু হোক—একটা পথ পেয়েছে, তারা কেন এই উদ্দেশ্যহীন কারণহীন অবিরাম আড্ডা দেবে? এরা শুধু বেকারই নয়—লেখাপড়া শেখে নি, পড়াশুনো করে না বলে এদের কথা বলার বা আলোচনা করার বিষয়বস্তুও সীমাবদ্ধ—এদের সঙ্গে তারা কী গল্পই বা করবে? তাই ছেলেদের দলও পাড়ায় বেশ

মোটা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। ভাল ছেলে, মানে যারা লেখাপড়া বা কাজকর্ম করে, কিছুদিন আগে যারা এদের সহপাঠী ছিল, তারা যে কথা কয় না কি অবজ্ঞা করে তা নয়—তাদের সঙ্গে এদেরই খাপ খায় না, জমে না। আলোচনার ক্ষেত্র এক নয়, ওদের কথা এরা বোঝে না, এদের কথায় ওদের ক্লান্তি বোধ হয়।...

প্রথম প্রথম হারুর খুব একটা খারাপও লাগে নি। এদেরই আদর্শ বলে বোধ হয়েছিল—এই নন্তু বাদল ফ্চুন ফোটে অবু—এদের। কিছুদিন প্রাণপণে এদের সমান হবার, যোগ্য হবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে যোগ্যতা তার নেই, সাহস বুদ্ধি ইচ্ছা কোনটাই না। এই যে ক্রমাগত পীড়ন—এবং চুরি করার জন্যে তাগিদ—এটা হারুর ভাল লাগে না। বোধহয় তার হাত-খরচের ঠিক এতটা অভাব নেই বলেই সে এতটা নিচে নামতে চায় না। কল চুরি, বাল্‌ব্ চুরি, সুযোগ-সুবিধা মতো বন্ধুদের বাড়ি থেকে এটা-ওটা সরানো—এক-আধবার চলতে পারে, নিত্য এই ষড়যন্ত্র ও আয়োজন খুব খারাপ লাগে ওর। অথচ ওরা ছাড়ে না, বলে, —'আমরা শালারা খেটে মরব, তোরা মজা লুটবি—না? সে হবে না। কথা যদি না শুনিস, চোরাই মাল বাড়িতে রেখে এসে সকলের সামনে টেনে বার করব, দাগী ক'রে দোব।'

ভয়ই দেখায় না শুধু—তাতায়ও। দুয়ো দেয়। বলে, 'ভীতু, কাওয়ার্ড। পরের ঘাড় ভেঙে খেতে জানিস শুধু। লজ্জা করে না?'

এমনি অবিরাম ধিক্কার শুনতে শুনতে পরশু দিন প্রায় মরীয়া হয়েই বলতে হয়েছিল হারুকে যে, সে ঐদিন ঠিক একটা কি দুটো কলের মুখ চুরি ক'রে ওদের চিহ্নিত জায়গায় রেখে আসবে। নিজের পাড়া থেকেই করবে, অন্য কারও বাড়ি থেকে কি রাস্তা থেকে—ভিন্‌পাড়ায় যাবে না। কলই বলেছিল সে, বাল্‌ব্ তো রাস্তায় নেবার মতো একটাও থাকে না—এ কাজে নন্তুর ফুচুনরা

সিদ্ধহস্ত, পরানোর রাতটা জ্বলে, ভোরেই সাফ হয়ে যায়। অগত্যা কলই ভরসা।

কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বলা এক জিনিস—সেটা কাজে পরিণত করা আর এক। চুরি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি আর, কোথায় করবে তাও ভেবে পায় নি। সবাই সেয়ানা হয়েছে আজকাল, সস্তা দামের প্ল্যাস্টিকের মুখ লাগায়। জ্যোতেদের বাড়ি পেতলের মুখ আছে—সে লোহার পাত দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। নিমুদাদের বাড়ির কথা বলেছিল নন্তু। ওদের উঠোনে আর খোলা বাথরুমটায় দুটো কল আছে বটে, কিন্তু বিপর্যয় উঁচু পাঁচিল। তার ওপর, ভাড়াটেদের কুকুর আছে একটা, বাচ্চা। যদিও বাদল বলে—বাদলরা সামনের বাড়িতেই থাকে—'দিনরাতই চেঁচায় শালা, ওর চেঁচানিতে কেউ কান দেয় না', তবু কথাটা ভাবতেই হারুর বুক ঢিব ঢিব করেছে, গলা শুকিয়ে গেছে। কখনও ঠিক এমনভাবে চুরি করে নি। যদি ধরা পড়ে? বিশেষ নিমুদাদের বাড়ি। নিমুদা নিত্য আসে ওদের বাড়িতে—বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকেও লজ্জা ঢাকতে পারবে না। নিমুদারই দেওয়া প্যাণ্ট-জামা পরে সে বারো মাস।···ছ-আনা ক'রে তো বিক্রি, এতেই যে ওদের কী লাভ হয় তাও ভেবে পায় না হারু।

অনেক ভেবেছে সে, আকাশ পাতাল। এমন একটা কলের কথাও মনে পড়ে নি, যেখান থেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে কল খুলে নিয়ে। তাই রাস্তায় বেরিয়ে এসেও ফিরে গেছে আবার, নিজের বাড়ির কল খুলে নিয়ে গদাদের বাড়ির ভাঙ্গা চালা ঘরটায় রেখে এসেছে।

অনেক ভেবেছিল সে, কিন্তু বাবার কথাটা ভাল ক'রে ভাবে নি। বাবা চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে তুললে একেবারে, চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরই বন্ধুদের নাম ক'রে ক'রে গাল দিতে লাগল। ফলে কারও আর জানতে বাকি রইল না যে, তাদের বাড়ির কল

চুরি গেছে। জানতে বাকি রইল না ফুচুন বাদল অবুদেরও। ওর আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না কারও কাছে।

সেই জন্যেই সারাটা দিন তার এই ভাবে কাটছে আরও। প্রতিদিনের সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রাণপণে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। একটু আগে স্টেশনে বসে ছিল, সেখানে তবু পাখা আছে—কিন্তু তাও, সেখানে বসে থাকতেও সাহসে কুলোল না। অনেক খুঁজে এই নির্জন জায়গায় এসে বসেছে, হয়ত কিছুক্ষণ শান্তিতে থাকতে পারবে। এই বেপোট জায়গায় চট ক'রে নজরে পড়বে না কারও।···

বাঘের মতোই পেছন থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। টুঁটি টিপে ধরার মতো ক'রে ধরে বলে উঠল, 'শ্-শালা! এবার কোথায় যাবে? আমাদের হাত থেকে কোথায় পালিয়ে বেড়াবে চাঁদু!'

ফুচুন! এই এক হয়েছে ত্যাঁদোড়। নাছোড়বান্দা একেবারে!

'নে ছাড়। সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আমার শরীর ভাল নেই আজ!'

অদ্ভুত একটা গলার স্বর বার করে ফুচুন।

'ই-ই-স্! এ যে বড়লোকের মতো বাত ঝাড়ছিস রে! বলি ব্যাপার কি রে! শরীর ভাল নেই—তুই কি বলবি! আগে পাঁচ-সাতশো টাকা রোজগার কর নিদেন, তারপর বলিস। আমাদের শরীর খারাপ হবে কিসে, কী খেয়ে?'

তারপর অপেক্ষাকৃত সহজ গলায় বলে, 'আসলে তুই একটা এক নম্বরের ভীতু। তোর ভয়টা না ভেঙে দিলে চলবে না!' এবার পকেট থেকে আধ-খাওয়া একটা সিগারেট বার ক'রে ধরায় ফুচুন, বলে, 'আজই তোকে হাতেখড়ি দিইয়ে দিই চল্। সাড়ে বারোটা নাগাদ তুলুদের গলির মোড়ে থাকব—তুই ছাদ দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে আসিস। ফের ঘরে ঢোকার সময় বাবা জেগে গেলে বলিস বাথরুমে গেছলুম। আমি সঙ্গে থাকব—তাহলে

তো তোর কোন ভয় নেই। পনেরো মিনিটে কাজ ফতে ক'রে চলে আসব। দেখিস কত ইজী কাজ—'

হঠাৎ রূঢ় হয়ে ওঠে হারু, চেষ্টা ক'রে বেপরোয়া হয় বলেই মরীয়ার শক্তি আসে তার মনে, 'না। আমি ওতে নেই। ওসব আমি পারব না। তো-শালাদের মধ্যেও আমি নেই। এসব ক'রে পেট ভরবে না তো। সারাজীবনও চলবে না। রোজগারের চেষ্টা একটা দেখতেই হবে। মিছিমিছি—তুটো-চারটে পয়সার জন্যে এত হ্যাঙ্গাম করার কিছু নেই।'

মুখ-চোখ যে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ফুচুনের—সেটা সেই আধো-অন্ধকারে ভাল ক'রে দেখতে না পেলেও টের পাওয়া যায়। সাপের মতোই হিসহিস ক'রে ওঠে ফুচুন, 'ত্থাখ, ওসব রোয়াবি লিস না বলে দিলাম। সন্ধ্যো থেকে ঢের বড়মানুষি ঝেড়েছিস—আর ও চেষ্টা করিস না। ওসব খাপ খুলিস নিজের বাড়িতে গিয়ে!—শ্-শালা! গলা টিপে মেরে লাইনে শুইয়ে দোব, পুলিসের বাবাও টের পাবে না। শালা সাধু সেজে এখন আমাদের দেখে নাক সিঁটকোতে চাও! ঐ নাক কেটে তোকে দিয়েই খাওয়াব!'

'ঢের হয়েছে। তোদের যা দৌড় জানি। তাহলে আর নেশার জন্যে ছ-আনার কল চুরি করতিস না, ট্রেনে গিয়ে ডাকাতি করতিস!'

উঠে পড়তে যায় হারু। খপ ক'রে ডান হাতখানা চেপে ধরে বাঁ হাতেই একটা চড় কষিয়ে দেয় ফুচুন। রোগা রোগা কেঠো হাতের চড়। সারাদিন অনাহারের পর সেই চড়ে তু-তিন মুহূর্তের জন্যে চোখে যেন অন্ধকার দেখে হারু, মাথা ঘুরে ওঠে। তবে তার স্বাস্থ্য ভাল, সামলে উঠতেও দেরি হয় না। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তু'হাতে ফুচুনকে কিল চড় মারতে শুরু করে। ফুচুন প্রথম একটুখানি পাল্টা মার চালাবার চেষ্টা ক'রে যখন বুঝল বেগতিক, তখন ল্যাঙ্ মেরে হারুকে ফেলে দিল সেই লাইনের পাশের নালামতো জায়গাটাতে—তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

॥ ১৯ ॥

এ লড়াইয়ের পরিণাম কি হ'ত তা বলা মুশকিল। উভয় পক্ষই হিংস্র হয়ে উঠেছে ততক্ষণে—খবরের কাগজের ভাষায়, পরিস্থিতিটা বাঁচিয়ে দিল চন্দন এসে পড়ে।

চন্দন কোথায় গিয়েছিল—টালিগঞ্জের দিকে—বাসে উঠতে না পেরে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। স্টেশনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সেইটে দিয়ে এসে লাইন ধরে এগিয়ে গেলে একটু কাছে হয় ওর বাড়িটা। সেই জন্যে অন্ধকার হ'লেও লাইন ধরেই আসছিল, চেনা পথ আর অল্পবয়সের আত্মবিশ্বাস—অন্ধকারকে বাধা মনে হয় নি।

অন্যমনস্ক হয়েই আসছিল চন্দন, এদের এই গজ-কচ্ছপের লড়াই নিঃশব্দে হ'লেও অস্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফেলার প্রবল শব্দ এবং অস্ফুট গালাগালি কানে এল ওর। তারপর থমকে নালার মধ্যে যুযুধান দুটো মূর্তিও দেখতে অসুবিধা হ'ল না। সে একলাফে কাছে এসে দাঁড়াল।

'শীগ্‌গির ওঠো—ওঠো বলছি!'

চন্দনের দৈহিক শক্তি বলতে কিছু নেই, ব্যায়াম যাকে বলে তা কখনও করে নি। খেলাধুলো, সেও নামমাত্র—আসলে পড়াশুনো নিয়েই থেকেছে চিরকাল, কিন্তু বোধহয় সেই জন্যেই, কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বতা প্রকাশ প্রায় খুব সহজেই। আর এই সব সময়গুলোয় এই ধরনের কর্তৃত্বের সুরে মনস্তাত্ত্বিক একটা ফল ফলে যায় দ্রুত—সেটা কোথা থেকে আসছে, কার কাছ থেকে—তা জানা কি বোঝার আগেই মানুষ তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। এরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরকে ছেড়ে, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

চন্দন আরও কাছে এল একটু। অন্ধকারের মধ্যেই তাকিয়ে দেখে বলল, 'তোরা! তোরা নিজেদের মধ্যে এমনি ক'রে দাঙ্গা করছিস? ছি ছি! লজ্জাও করে না! বন্ধু তোরা—হয়ত কিছু

মনকষাকষি হয়েছে কি কথাকাটাকাটি—তার জন্যে হাতাহাতি করতে হবে? কী রে তোরা!…যা, বাড়ি যা। অনেক রাত হয়েছে। দু-দুটো ধেড়ে ছেলে—ঝগড়া ক'রে এই নালার মধ্যে খোয়ার ওপর পড়ে—হয়ত কত ময়লা আছে মানুষ আর কুকুরের—কুস্তি করছিস্! এই বয়সে!'

মানুষটা কে দেখার পর ভয় ভেঙেছে। পুলিস ভাবে নি এটা ঠিকই, তবু ভয় একটু করেছিল দুজনেরই। এখন সেজন্যে মনে মনে যেন একটু লজ্জাই অনুভব করল, রাগও হ'ল বেশ যেন চন্দন ওদের বড়রকম ঠকিয়েছে একটা। ফুচুন একটা অবজ্ঞার শব্দ ক'রে বললে, 'য্‌যা যা! যেখানে যাচ্ছিস যা। আমাদের কাছে ফুটুনি মারতে আসিস নি। আমরা মারামারি করছি করছি, তোর কি? সিধে পথ পড়ে আছে, বাড়ি যা—যদি ভাল চাস তো!'

চন্দন বললে, 'হ্যাঁ, সিধে পথেই যাচ্ছি, নইলে তো তোদের মতো এইখানে পড়ে মারামারি শুরু করতে হয়! তবে এখনই বাড়ি নয়, তোদের দুজনের বাড়ি খবর দিয়ে তবে নিজের বাড়ি যাবো!'

কথার মাঝামাঝি আসতে ফুচুন একটা হাত তুলতে যাচ্ছিল মারবার ভঙ্গিতে—কিন্তু বাড়ির কথা শুনে হাতটা পড়ে গেল আপনিই। অবশ্য তবু মুখসাপোট বন্ধ হ'ল না, বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যা। তাছাড়া আর তুই কি করবি! মরদের বাচ্চা হ'লে লড়ে যেতিস, মেনিমুখো তুই—চুকলি খাওয়া ছাড়া আর কি করবি!'

চন্দন আর কথা বাড়াল না। তবে সত্যি-সত্যিই নিজের বাড়ির পথ ছেড়ে উল্‌টো পথে স্টেশনের দিকেই ফিরল আবার। ফুচুন যত না হোক—হারু ভয় পেয়ে গেল তাতে, কিংবা ফুচুনের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রশ্নটাও ছিল তার মনে—বললে, 'একটু দাঁড়া চন্দন, আমিও যাচ্ছি।'

ফুচুন গজ্‌রে উঠল, 'না না—খাক শালা, কত চুকলি খেতে পারে খাক। ওর সঙ্গে যাস না। আমি আর কিছু বলব না।

কিন্তু ওর সঙ্গে গেলে কাল শালা আর মুখ দেখাতে পারবি না। রাস্তায় বের হওয়া বন্ধ ক'রে দোব—এই বলে দিলুম !'

তা পারে এরা। এদের অসাধ্য কিছু নেই। হারু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চন্দন ওর কথাতে একটু দাঁড়িয়েছিল—এখন ব্যাপারটা বুঝে আবার চলতে আরম্ভ করল।

ফুচুন যেন ক্ষেপে উঠল এবার। অথচ চট্ ক'রে এমন কোন অপমানের কথা মনে পড়ল না, যা চন্দনকে যথেষ্ট আঘাত করতে পারে—বা দৈহিক কোন ক্ষতি হয়। সে চলে যাচ্ছে, আর ওদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে সম্ভবতঃ—অক্ষত দেহে অনায়াসে চলে গিয়ে চুকলি খাবে—কথাটা মনে হ'তে হিংস্র মরীয়া হয়ে যেটা মনে পড়ল সেই কথাটা বলেই আঘাত করতে চাইল, চিৎকার ক'রে বলে উঠল, কথাগুলো দিয়েই ছুঁড়ে মারার মতো ক'রে—'বরং তোর সেই অমুকতুতো দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়, আমরাও ততক্ষণে ঝোপঝাপ দেখে রাখি !'

আবারও একবার থমকে দাঁড়াল চন্দন। মনে হ'ল যেন ফিরেই আসবে এদিকে। এই আধো-আলোয় তার মুখের চেহারাটা দেখা না গেলেও তার সেই প্রজ্বলন্ত ক্রোধটা যেন দুজনেই অনুভব করল এখান থেকে, সেই আকারহীন উত্তাপটা যেন এখান পর্যন্ত পৌঁছল। তবু কী ভেবে আর ফিরল না, যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই চলতে শুরু করল।

ঠিক বন্ধু যাকে বলে চন্দন তা নয়। বন্ধুও না, সহপাঠীও না। চন্দন এক ক্লাস না দু-ক্লাস ওপরেই পড়ত এদের—হারু আর ফুচুনের। তবে কখনও ফেল করে নি বলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ফেল না করলেও এমন কিছু অসাধারণ ছাত্র নয়। মানে ফার্স্ট সেকেণ্ড কখনও হয় নি, স্কলারশিপও পায় নি। পাস ক'রে

গেছে বরাবর—এই পর্যন্ত। স্ট্যাণ্ড করা যাকে বলে, তা করতে পারে নি। তার কারণও ছিল। বাবার পরিণত বয়সের সন্তান, ও ইস্কুলে পড়তে পড়তেই তাঁকে রিটায়ার করতে হয়েছে। খুব বড় চাকরিও কিছু ছিল না, তাছাড়া চন্দনের দিদির বিয়ে দিতে তাঁকে পেন্‌সন বেচতেও হয়েছে খানিকটা। বাকী যা থেকেছে তাতে সব খরচ চালানো মুশকিল। তাঁরা কিছু বলেন নি, কিন্তু চন্দন নিজেই উদ্যোগী হয়ে ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তেই টিউশানী ধরেছে। নিচের ক্লাসের ছাত্র, দশ-বারো টাকার টিউশানী, তবে তাতেই ওর পড়ার খরচ চলে গেছে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার পর বেশী মাইনের টিউশানী যেমন পেয়েছে, নিজের পড়ার খরচও বেড়ে গেছে।

বি. কম. পাস করেছে অবশ্য ভালভাবেই—অনার্স নিয়ে। তবু, স্কলারশিপ-টিপ কিছু পায় নি। আর পড়ার চেষ্টা করে নি। নিজে বাড়িতে চর্চা ক'রে গেছে। এম. কম পড়তে হ'লে যেসব বই পড়তে হয় বা একসারসাইজ করতে হয়—নিয়মিতভাবেই পড়ে ও লিখে গেছে। এ ছাড়া দুটো-তিনটে টিউশানী ক'রে সংসার চালিয়েছে। সেই সঙ্গে ক্রমাগত পরীক্ষা দিয়ে চাকরির চেষ্টা দেখেছে। প্রায় বছর দেড়েক পর সে চেষ্টার ফলও ফলেছে। একই সঙ্গে দুটো চাকরি পেয়ে গেছে সে, একটা সরকারী একটা আধা সরকারী—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কটাই নিয়েছে সে, মাস-তিনেক হ'ল সেখানে বেরোচ্ছে।

নিজের লেখাপড়া, টিউশানী—সেই সঙ্গে সংসারের কাজ, বাবার শরীর খারাপ, দৈনিক বাজারটাও সব দিন করতে পারেন না, র‍্যাশন ধরা তো দুঃসাধ্য; সেগুলোও চন্দনকেই করতে হয় —এইতেই তার দিনরাতের মাত্র-কয়েক-ঘণ্টা অবসর ঠাসা, আড্ডা দেওয়া হয়ে ওঠে না। চন্দন এদের অবজ্ঞাও করে না, এড়িয়েও যায় না, দেখা হ'লে দুটো-চারটে কথা, একটু হাসি-তামাশাও করে —তবু এদের মনে হয়, সে ভাল ছেলে এমনি একটা অহঙ্কারে সে

এদের পরিহার ক'রে চলতে চায়, এদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।

চন্দনের এত অবসর ছিল না যে, এদের নিয়ে মাথা ঘামায়। এরা কি ভাবছে না ভাবছে ওর সম্বন্ধে, তা নিয়ে যে কোন মাথাব্যথা নেই শুধু তাই নয়—এরা ভাল কি মন্দ, মেশবার যোগ্য বা অবজ্ঞার পাত্র—এত বিচার-বিবেচনারও সময় নেই। ব্যস্ত সে সব দিকেই। অর্থোপার্জন, সংসার বা বাবা-মা ভাই-বোনের চিন্তাই নয়—হৃদয়ের দিকে, অন্তরের দিকেও একটা বিরাট জট পাকিয়ে গিয়েছিল। বিপুল—দুশ্চিন্তা হয়ত নয়—চিন্তার ব্যবস্থা ক'রে তুলেছিল সে নিজেই। স্বখাতসলিল।

পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে যখন চাকরির চেষ্টায় নামল তখন, প্রয়োজন হ'তে পারে ভেবে, সে সময় একটা শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিংয়ের স্কুলেও ভর্তি হয়েছিল দিনকতক। বাড়িতে বসে নিজে নিজে লেখাপড়াটা চলত কিন্তু ও দুটো শেখা সম্ভব ছিল না। মধুপর্ণা মেয়েটিও সেই স্কুলে আসত, একই উদ্দেশ্যে। সে স্কুল ফাইন্যাল পাস মোটে—কিন্তু চন্দনের চেয়ে বয়সে বড়, অন্ততঃ চার-পাঁচ বছরের তো বটেই। একদফা সংসারের পালা চুকিয়ে নতুন ক'রে জীবন শুরু করেছে সে। অর্থাৎ তার বিয়ে হয়েছিল, একটা বাচ্চাও হয়েছিল—শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসবার পথে বাস য়্যাক্সিডেন্ট হয়ে স্বামী, সে বাচ্চা দুই-ই যায়, যেতে পারে নি শুধু সে। স্বাভাবিক কারণেই এর পর শ্বশুরবাড়িতে জায়গা হয় নি তার, সব খুইয়ে বাপের বাড়িতে এসেই উঠতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করতে হচ্ছে। বাবা ভাড়া-বাড়িতে থাকেন, সম্পত্তি বলতে, কিছু নেই, মা বাবা চোখ বুজলে পথে দাঁড়াতে হবে। এক দাদা আছে, সে এক অ্যামেচার থিয়েটারের অভিনেত্রীকে বিয়ে ক'রে পৃথক্ বাস করছে। তাদেরও, যত সাধ আছে তত সাধ্য নেই। এটা ওটা ক'রে কিছু রোজগার করে, তাতে সংসার চলে না, তাই বৌকে এখনও আপিস ক্লাবের

থিয়েটারে ভাড়া খাটতে হয়। আরও সেই কারণেই মধুপর্ণার বাবা বাড়িতে রাখতে রাজী হন নি, নইলে খুব শুচিবায়ু তাঁর নেই, এসব ব্যাপারে। অথচ তাঁরও রিটায়ার করার বয়স হয়ে এল। তাঁর এমনিতেই সামান্য আয়, পরে সে আয় আরও কমবে। এই সব ভেবেই মধুপর্ণা পাগলের মতো চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিল আর তার যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে যে যা বলছে তাই শিখছিল। টাইপ-রাইটিংটাও সেই শেখারই একটা অংশ। তার সঙ্গে সেলাই এবং বাজনার ক্লাসও করত।

কোথায় একটা মিল ছিল ওদের মনের চেহারায়—দুজনেই আকৃষ্ট হ'ল দুজনের দিকে। সেটা ওরা তত বুঝতে পারে নি, প্রেম বলে তো বোঝেই নি, কিন্তু বাকী সবাই বুঝেছে। হাসিঠাট্টা কানাঘুষো শুরু হয়েছে চারিদিকেই—ক্রমশঃ সেটা বাবা মায়ের কানেও পোঁচেছে। তখন তো বিয়ের প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু পরেও যাতে না থাকে, সেই জবানটা নেবার জন্যে চন্দনের বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর আপত্তি তিনটে : বিধবা, বয়সে বড় এবং ভিন্ন—তাঁর মতে ছোট - জাত।

চন্দন ধীরভাবেই শুনল, তাঁদের উত্তেজিত যুক্তি। জবানও দিল। তবে যে জবান তাঁরা চেয়েছিলেন, সেটা নয়। সে বলল, 'তোমাদের অমতে এ বিয়ে আমি করব না কথা দিচ্ছি, তবে তোমরাও আমাকে আর অন্য বিয়ে করতে বলো না, সে কথা আমি রাখতে পারব না। বিয়ে করলে একেই করব—নইলে নয়।'

মা রেগে গেলেন. 'ঐ সব্বনাশীকে বিয়ে করবি? সব জেনেশুনে? এই বয়সে সব ঘুচিয়ে স্বামীপুত্তুর খেয়ে এল যে—সেই রাক্ষুসীকে!'

চন্দন বলল, 'তোমরা তো বলো আমাদের শাক্তবংশ, সর্বনাশীরই তো সাধনা আমাদের। কালীঘাটে যাও, ঘরে মা কালীর পট রেখে পুজো করো প্রত্যহ—তিনি তো শ্মশানবাসিনী। একবার

একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলে বারবারই ঘটবে—এ আমি লেখা-পড়া শেখার পরও বিশ্বাস করতে পারব না।'

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা ভাল বোঝো তাই ক'রো। শুধু দয়া ক'রে আমি শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রো। ...তবে এও আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার এখন এই বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, ওর বোধহয় সাতাশ কি আটাশ। আজ থেকে দশ বছর পরে তোমার হবে বত্রিশ, তখনও তুমি যুবক থাকবে —কিন্তু সাঁইত্রিশ বছরে ওর চেহারাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?'

'পৃথিবীতে অনেকেই বয়সে-বড় মেয়ে বিয়ে করেছেন বাবা —হজরত থেকে শুরু করে নেপোলিয়ন পর্যন্ত—এখনও প্রচুর ছেলে করছে। বেশির ভাগ লোকই বিবাহের প্রস্তাবে এটাকে কোন বাধা বলে মনে করে না। তাছাড়া দশ বছর পরে—এখন যে দেহটাকে আমি পছন্দ করছি সেটা হয়ত থাকবে না—তেমনি ততদিনে দেহটা পেরিয়ে আমরা পরস্পরের মন পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, পছন্দ করার স্টেজ পেরিয়ে ভালবাসার স্টেজে পৌঁছব, তখন আর দেহটার কথা মনে থাকবে না!' ..

সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে প্রসঙ্গটা। কোন পক্ষই নিজের কোট ছাড়ে নি। মধুপর্ণা অবশ্য চন্দনকে নাকি বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, 'এসব মতলব তুমি ছেড়ে দাও চন্দন। মিছিমিছি এ নিয়ে আর অশান্তি ক'রো না। জীবনে কোন দিনই বাবা-মার মতের বিরুদ্ধে যাও নি, আজ এই ভাইটাল প্রশ্নে আর না-ই বা গেলে!'

চন্দন বলেছে, 'ভাইটাল বলেই মেনে নিতে রাজী নই। আর অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমি যদি তাঁদের কথা শুনে থাকি, তাঁদের কথা ভেবে থাকি—এই একটা ক্ষেত্রে তাঁরা আমার কথা শুনবেন না, আমার কথা ভাববেন না কেন? এটুকু কি আমার পাওনা নয় তাঁদের কাছে? আমিই শুধু এক তরফা তাঁদের শান্তি দিয়ে যাবো, তাঁদের কোন কর্তব্য নেই?'

'সে কর্তব্য আছে বলেই হয়ত রাজী হচ্ছেন না। তোমার কথা ভাবছেন বলেই এত আপত্তি করছেন। তাঁদের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়—বয়সের প্রশ্নটা তো নয়ই। অমন জেদ ধরার আগে আর একটু ভাল ক'রে ভেবে ছাখো।'

তারপর একটু থেমে, একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবে বলেছে, 'আরও একটা কথা ভাবা উচিত চন্দন। আমারও তো এই নতুন চাকরি, সামান্ত মাইনে—এ টাকাটা থেকে আমার বাবা-মাকে বঞ্চিত করতে পারব না। তাঁদের আর কেউ নেই।···দাদার অবস্থা তো আরও শোচনীয়—কোনদিন যদি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই বাড়িতে এসে ওঠে, আমি আশ্চর্য হবো না। আর তখন—ফেলতেও পারব না। এ টাকা যদি না ধরো—তোমার ঐ টাকা কটাই ভরসা, ভবিষ্যতে বাড়বে হয়ত, এখন তো ঐ চারশো তিরিশ।·· তোমারও সংসার ছোট নয়, এখনও ছুটো ভাই বোন মানুষ হ'তে বাকী। এখন বোধহয় দীর্ঘদিন আমাদের কারুরই জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।'

'এখন জড়িয়ে পড়ব তা তো বলি নি। আর সে কথা বাবা-মাও জানেন। তাঁরা সেই সুদূর ভবিষ্যৎটা পর্যন্ত চেয়ে দেখছেন, সেখানটা পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের অধিকারে আনতে চান, তাতেই আমার আপত্তি।···অপেক্ষা করতে হবে, করবও ঃ চার পাঁচ বছর তো করতেই হবে—তবে তোমার ক্লেম ছাড়ব না '

তারপর হেসে বলেছে, 'পর্ণা, শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাণ্টলি পামার বলে এক বিস্কুট-কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিত—বেচারারা তখনও এ সাম্রাজ্য হারাতে হবে তা জানত না—যে, যুদ্ধ থামুক আবার আপনারা বিস্কুট পাবেন, ততদিন অপেক্ষা করুন। ইট ইজ ওআর্থ ওয়েটিং ফর। আমারও তাই ধারণা।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকেছে তুজনেই। সুখে আনন্দে মধুপর্ণার মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে, চন্দন সেদিকে চেয়ে থেকেছে অপলক চোখে।

একটু পরে আরও লজ্জিত ভাবে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেছে মধুপর্ণা, 'আচ্ছা, শুনেছি কোন কোন হোটেলে ছু-তিন ঘণ্টার জন্যে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়—তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তুমি যদি চাও, সেভাবে মধ্যে মধ্যে কোথাও একটু নিরিবিলি কাটিয়ে আসতে পারি। তোমার তৃপ্তি কি আনন্দের জন্যে আমি সমস্ত লজ্জা, সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞান বিসর্জন দিতে রাজী আছি।'

'ছি!' চন্দন প্রবল ভাবে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠেছে, 'যদি শুধু তোমার দেহটার ওপরই লোভ হ'ত, দৈহিক প্রয়োজনটাকেই সকলের ওপরে স্থান দিতুম—তাহলে তো বাবার কথাই শুনতুম। সেদিক দিয়ে ভেবে দেখলে, সাধারণ দিকই সেটা—তাঁর যুক্তি অকাট্য, কিন্তু আমি তোমার ভালবাসা চাই পর্ণা, ভালবাসতে চাই। তোমার সঙ্গ সাহচর্য চাই, তোমাকে পাশে রেখে দুঃখের জীবন পার হ'তে চাই। তুমি যোগাবে সে লড়াই করার শক্তি। শূন্য পাত্র ভরে দেবে। না-ই বা পেলাম অনেক টাকা মাইনে, তাতে কি খুব ক্ষতি হ'ল ভাববে? গরীবের সংসারে থাকতে পারবে না তুমি? টাকার প্রশ্নটাই কি জীবনে বড় হবে তোমারও?'

মধুপর্ণা বলল, 'এখনও বিয়ে হয় নি—তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট নইলে তোমার পায়ের ধুলো নিতাম!'···

এই প্রসঙ্গ আর এদের ভবিষ্যৎ আজও সেই অনিশ্চিত অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু ওদের কথাবার্তা বা বাদানুবাদের ইতিহাসটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, প্রায় সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেছে। পাড়াঘরে কারুরই জানতে বাকী নেই বোধ হয়। প্রথম পরিচয়ে 'পর্ণাদি' বলত ওকে চন্দন, সেইটেই এখন ব্যঙ্গবিদ্রূপ তামাশার প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, বড় ইন্ধন।

॥ ২০ ॥

আজও সেই অস্ত্রেই ওকে বিঁধতে চেষ্টা করল ফুচুন।

অস্ত্র ছাড়ার পর, সেটা যথাস্থানে আশানুরূপ আঘাত করতে পারল কিনা—না জানা পর্যন্ত স্বস্তি থাকে না। আর যদি সে অস্ত্র ছাড়ার পিছনে কোন বিদ্বেষ থাকে তাহলে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা প্রচণ্ড আক্রোশ সৃষ্টি করে।

ফুচুনেরও বিরক্তি বিরূপতা—পূর্বের ঈর্ষা, সব মিলিয়ে আক্রোশে পরিণত হ'ল। চন্দন বিনা প্রতিবাদে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সে যেন ফেটে পড়ল একেবারে।

'শ্-শালা! একটা চাকরি পেয়ে মনে করেছে যেন সবাইকার মাথা কিনে নিয়েছে!···বলে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। কখ্খনও না!···কী এমন ছেলে ও যে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবে? নিশ্চয় ওর বাবাটা কাউকে ধরে বাগিয়েছে—ফাঁট লিচ্ছে ও।··· কিংবা ওর ঐ মেয়েছেলেটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল কোন অফিসারের কাছে। ও-ই টোপ ফেলে কাজ বাগিয়েছে।'

'যাঃ! তা কেন,' হারু বলে, 'ও তো সেক্রেটারিয়েটেও কাজ পেয়েছিল, লিস্টে নাম বেরিয়েছিল, নীলুর দাদা নিজে দেখেছে।'

'থাম্ বে। ওসবই ঐ ব্যবস্থা—কী এমন রেজাল্ট্ করেছিল তাই শুনি! কখনও স্ট্যাণ্ড করলে না, কখনও একটা বৃত্তি পেলে না—সে অমনি একটার পর একটা পরীক্ষা দিচ্ছে আর চাকরি পেয়ে যাচ্ছে! ওরে, অত সোজা নয়!'

'ফার্স্ট সেকেণ্ড যেমন হয় নি তেমনি গাড্ডুও তো মারে নি কখনও। দিনরাত পড়াশুনো নিয়েই তো থাকে, আমাদের মতো গজালি ক'রে দিন কাটায় না তো।'

এবার ক্রুর হয়ে ওঠে ফুচুন, এক রকমের চাপা বিকৃত গলায় বলে, 'তোরও ঘেন্না হয়েছে আমাদের গজালিতে, না? আমাদের

তেতো লাগছে!…তোরও বুঝি কাউকে ধরে একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে? তাই চাকরির পর পাছে আমরা টাকা ধার চাই—এখন থেকে কাটান-মন্তরের তাল খুঁজছিল? না কি ঐ শালা চাকরি ক'রে দেবে ভেবেছিস তাই ওর চামচা বনে যাচ্ছিস!… ভাবছিস দুটো চারটে চাকরি অমনি গাছের প্যায়রার মতো পেড়ে দেবে। ওরে অত যদি সোজা হ'ত তোর নিমুদাই তো একটা ক'রে দিত। অত গুষ্টিবগ্‌গ মিলে তার পায়ে পড়ে আছিস, মাথা বিকিয়ে দিয়ে!'

তারপর খানিক গুম খেয়ে থেকে—যেন ভেতরে ভেতরে জ্বালায় ছিট্‌ফিটিয়ে উঠছে—এমনি ভাবে এক সময় বলে উঠল, 'শালা ধরাকে সরা দেখেছে একেবারে একটা চারশ' টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে, আমাদের আর মানুষ বলেই মনে করে না। দেব শালাকে এমন শিক্ষা -! ··সরিয়েই দেব একেবারে। ওর ঐ পুঁয়ে-পাওয়া বাপটা আর মাগীটার সামনে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে শুইয়ে রেখে আসব। দেখিস। বড্ড বাড় হয়েছে। ওকে যদি সাবাড় না করি তো আমার নাম নেই!'

হারু ওর গলার আওয়াজ আর—অন্ধকারে যতটা দেখা যায়—মুখের চেহারায় ভয় পেয়ে গেল। এ কাজ ফুচুন একা না পারলেও, ওদের দল পারে অনায়াসে। ক'বছর আগে অনেক খুন হয়ে গেছে পাড়ায়—একটারও কিনারা হয় নি। তাতেই ওদের সাহস বেড়ে গেছে। সে সব খুনের মধ্যে কারা ছিল—অনেকেই জানে, বলতে সাহস করে নি। এখনও এরা যদি কাউকে সাবাড় করে— জানলেও কেউ পুলিসের কাছে কবুল করবে না।

সে ফুচুনের একটা হাত ধরে বসাবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'বোস, বোস। ঠাণ্ডা হ। একটা সিগারেট ধরা। আজ তোর মেজাজটাই গুড়খাট্টাই হয়ে আছে দেখছি।···মিছিমিছি—। চন্নন তোকে কিছুই অপমান করে নি। কাউকেই সে ছোট ক'রে দেখে না। তার সময় কম বলেই—'

এক ঝাঁকানিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুচুন ঝেঁঝে উঠল, 'ছাখ, ঐ সব চামচাগিরি আমার কাছে ঝাড়তে আসিস নি। কুন্‌কুন্‌ ক'রে ওর সাফাই গাইতে এসেছে। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—শালা। ওর মাইনে খাস নাকি? বজ্জাত বেইমান কোথাকার। দোব তোকে সুদ্ধ সাবাড় ক'রে—একেবারে সেখানে গিয়ে চামচাগিরি করিস।'

বলতে বলতে ফুচুন এমনভাবে তেড়ে এল—মনে হ'ল এখনই সে প্রস্তাবটা কাজে পরিণত করবে। হারু আর কথা বাড়াল না, কোন কথাই কইতে সাহস হ'ল না। ফুচুনকে ঠাণ্ডা করা যায় এমন একটা কথাও মনে পড়ল না। ক'টা পয়সা হাতে গুঁজে দিতে পারলে ঠাণ্ডা হয়—কিন্তু সে পয়সা ওর নেই। তাই ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল চুপ ক'রে। শুধু আবার না ল্যাং মেরে কায়দা করতে পারে—প্রাণপণে সেইদিকে লক্ষ্য রাখল।

ফুচুন হয়ত অত কিছু করত না—কিন্তু করার সুযোগও রইল না। অদ্ভুত এক রকমের শিস্‌ বেজে উঠল—প্ল্যাটফর্মের নিচে সেলুনের সামনের খাঁজমতো জায়গাটা থেকে। এটা ওদের দলের নিশানা করা শিস্‌, কেউ জানতে চায় দলের আর কোন ছেলে কাছাকাছি আছে কিনা।

ফুচুনও ঠিক তেমনিভাবেই পাল্‌টা শিস্‌ দিল। খুবই আস্তে। তবু, নিষুতি-হয়ে-আসা রাত্রে শোনার কোন অসুবিধা রইল না। যে খুঁজতে এসেছিল সে রেলের স্লীপার ধরে দ্রুত এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতে দেখা গেল সজল।

সজল ওদের চেয়ে ছোট—দু'বার হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করেছে সবে—টোকবার সব রকম সুযোগ সত্ত্বেও—কিন্তু তবু সে যেন কেমন ক'রে এদের বন্ধু হয়ে উঠেছে। অথবা বলা যায়, দু'স্তরের—দু'দলের মধ্যকার সেতু ও। ওর বয়সী ছেলের দলেও সজল আছে, আবার এদের সঙ্গে মিশতেও সঙ্কোচ নেই। শুধু তাই

নয়, এদের সবাই ওর থেকে বয়সে বড় কিন্তু সবাইকেই সে তুই-তোকারি করে।

সজল একেবারে এদের কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না, খানিকটা দূর থেকেই চাপা গলায় বলে উঠল, 'এই শুনেছিস, মহা একটা গুবলিস হয়ে গেছে!'

'কী রে, কি হয়েছে!'

যা হয়েছে তা সজল একেবারে এক কথায় বলতে পারল না। হাঁপাচ্ছিল সে তখন। দফায় দফায় অনেক জেরা ক'রে যা জানা গেল তা এই :

সজলের যমজ ভাই কাজল আর তার বন্ধুরা অনেক দিনই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছে। দাগা ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়—দোকানদার-বাজারওলাদের নানারকম ভয় দেখিয়ে নেশার পয়সা আদায় করে। হঠাৎ বছরখানেক আগে ওদের দলের বাবুয়া আর পক্ষীরাজ—ছুটো ছেলের এক মতলব খেলে গেল মাথায়। একটা জমি পড়ে ছিল অনেক দিন থেকে—জমির মালিক সেখানে এক কালে ছিটে বাঁশের দেওয়াল টিনের চাল দিয়ে গ্যারেজ বানিয়েছিল, কিন্তু পর পর ছু'বার সে দেওয়াল কেটে গাড়ির চাকা ইঞ্জিন ইত্যাদি চুরি যাওয়ায় গাড়ি অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করেছেন। গ্যারেজটা কিন্তু ভাঙেন নি, সেই অবস্থাতেই পড়ে ছিল।

ঐ ঘরটাই বাবুয়ারা জবরদখল ক'রে—সারিয়ে চলনসই ক'রে নিতে যা যা দরকার চুরি ক'রে এনে—রাতারাতি ক্লাব বসিয়ে ফেলল। সেখানে বসে ওরা তাস খেলে আর সিগারেট খায়, মওকা মিললে একটু-আধটু মদও—এ-ই জানত সবাই। সে তাস খেলাটা যে জুয়া খেলা তা এমন কি সজলও টের পায় নি।

এই জুয়ার আড্ডায় ওরা নতুন এক রোজগারের ফন্দী করেছিল। অন্য পাড়ার ছেলেদের নানা ছুতোয় নানান লোভ দেখিয়ে ডেকে আনত—এই লোভ দেখানোর জন্যে নাকি তথাকথিত

ছু-একটি কলেজের মেয়েও আমদানী করেছে ওরা—যারা আসত তাদের কেউ কেউ নিজে থেকেই খেলাতে ঝুঁকে পড়ত, কাউকে বা প্রথমটা অনেক অনুরোধ উপরোধ করতে হ'ত। এই সব বাইরের ছোকরা খেলতে শুরু করলে প্রথম প্রথম জেতে—যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, সব জুয়ার আড্ডাতে বা মাঠেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ জিতিয়ে দেওয়া হয়। আনাড়ীর লাকও আছে খানিকটা। তারপর নেশা ধরে গেলে হারতে শুরু করে। এখানেও তাই হ'ত। প্রথম প্রথম পাঁচ নয়া বাজি ধরা হ'ত। যে জেতে তার পক্ষে এটা হাস্যকর, সে ভাবে মজুরী পোষায় না। সে-ই জেদ করে বড় বড় অঙ্কের বাজির জন্যে। যত হারে তত অঙ্ক বেড়ে যায়। এসবই জুয়া খেলার সাধারণ নিয়ম—কেবল সেটা এরই মধ্যে যে ওরা—কাজলরা এই বয়সেই জেনে গেছে, সেইটেই অসাধারণ।

টাকার অঙ্ক বাড়ে বলেই পকেটের টাকা ফুরিয়ে যায়, তখন ধার দেবার মতো সদাশয় লোকের অভাব ঘটে না। এখানেও তাই হ'ত। টাকা ধার দেওয়া মানে কাগজে কলমে, যেটা হারত, সেইটেরই রসিদ লিখে দিত—জুয়া খেলার জন্যেই এই টাকা ধার করেছে ওরা, সেটাও স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকত।

এর পর নির্দিষ্ট দিন পার হ'লে সে টাকা আদায়ের জন্যে জুলুম শুরু হ'ত। বাবা-মাকে এই কাগজ দেখানো হবে, এই ভয়েই অনেকে দিত, যেমন ক'রে হোক, কিন্তু কোন কোন ছেলে দিত না। কারও সে ভয় নেইও। এই রসিদ নিয়ে মামলা মকদ্দমা করা যায় না। এদের বলা হ'তে লাগল যে, অমুক তারিখের মধ্যে না দিলে তাকে খুন করা হবে। তাতেও কাজ না হ'লে বেধড়ক পিটুনি দেওয়া হ'ত। কিন্তু দু-একজন আরও ত্যাঁদড় আছে, যাদের লজ্জার বালাই নেই—তারা দল জুটিয়ে এনে এদের পাল্টা ভয় দেখাত। অগত্যা সত্যিসত্যিই একটা খুন করতে হ'ল।

সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এর পর নির্বিবাদে টাকা উশুল হচ্ছিল। একজন. পূর্ণেন্দু—নতুন চাকরির মায়া ছেড়ে আপিস থেকে টাকা

চুরি ক'রে এনে জান বাঁচিয়েছে। ফলে সে চাকরি গেছে তার। তবু কেউ পুলিসে জানাতে সাহস করে নি। পুলিশ বিপুলের খুনেরও কোন কিনারা করতে পারে নি, দু-একজনকে ধরে কিছুদিন হাজতে রেখে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু এদের হিসেবে একটা মস্ত ভুল হয়ে গিছল। খুন করেছিল ওরা ফার্ণ রোডের বুলি মিত্তিরের ছেলে বিপুলকে। বুলি মিত্তির যে কী প্রকৃতির জাহাঁবাজ লোক সেটা এরা জানতে পারত —অত গ্রাহ্য করে নি। বুলি মিত্তির পুলিশের তোয়াক্কা করে নি। মাস দু-তিন ঘুরে তক্কে তক্কে থেকে এদের দলেরই কোন ছেলেকে হাত করেছে, হয় তাকে প্রচুর টাকা খাইয়েছে—নয় তো কোন প্রবল লোভ দেখিয়েছে। সেইখান থেকেই সব খবর 'লীক্' হয়েছে। সে-ই খবর দিয়েছে যে, আর একজন ত্যাঁদড়কে সাবাড় করা হবে আজ। তাকে ধরে কাজলের দল 'মশানে'—মানে দূর লাইনের ধারে রওনা দেবে—সেই সময় পুলিশ এসে হাতেনাতে ধরেছে। সে ছেলেটার মুখে রুমাল পোরা, হাত-বাঁধা—পিছনে পিস্তল—সেই অবস্থাতেই এরা এসে ঘিরেছে। যারা নিয়ে যাচ্ছিল তারা তো ধরা পড়েছেই, দলের প্রায় সবাই ফেঁসেছে। ক্লাবে জোর জুয়া চলছে তখন। এই 'বধকাণ্ড'র কথা যাতে বেশী কেউ না জানতে পারে সেই জন্যেই আজ খেলার সমারোহ একটু বেশী ছিল —পুলিশ সেই অবস্থায় ঢুকেছে সাক্ষীসমেত। শুধু তাই নয়—নন্তু ওখানে কী একটা ফিকিরে গিয়েছিল, বোধহয় সেও শুনেছিল এদের কীর্তি—এদের ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে কিছু ভাগ নেবে— বোধহয় এ-ই ছিল মতলব—ব্ল্যাকমেল না কী যেন বলে ইংরেজীতে —সোজাকথা চোরের ওপর বাটপাড়ি—তাকেও ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

সব শুনে ফুচুন স্তম্ভিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তার এতক্ষণের হম্বিতম্বির দাপট সব যেন পিনফোটানো-বেলুনের হাওয়ার মতো বেরিয়ে গিয়ে মানুষটা চুপ্‌সে গেল।

কাজল-বাবুয়া-পক্ষীরাজের দল এত কাণ্ড করেছে, এদের ওপর টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে—এরা কিছুই জানে না, খবর রাখে না! ওদের এত বুদ্ধি! আর এরা ছুটো বিড়ি কিংবা সিগারেটের জন্যে রাস্তার কল বাল্‌ব্‌ চুরি ক'রে বেড়ায় সারারাত জেগে!

নিজেদের খুব বোকা আর বেচারা মনে হ'তে লাগল। মনে হ'ল ঐ ছেলেগুলো বিষম ঠকিয়েছে তাদের। এক রকমের জুচ্চুরিই করেছে বলতে গেলে।

প্রথম কিছুক্ষণের বিহ্বলতাটা কাটতে রাগও হ'ল।

রাগ—ওদের ওপর তো বটেই, নিজেদের ওপরও। ক্রমে, সবটা মাথায় যেতে, তলিয়ে বোঝার পর প্রচণ্ড রাগ হ'ল নন্তুর ওপর।

'বেটা ধরা পড়েছে বেশ হয়েছে। বেইমান শালা! আমাদের সঙ্গে এত মাখামাখি, দিনরাত একসঙ্গে বেড়াচ্ছি, আমাদের একটা কথাও না বলে তলে তলে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে! এ-ই বন্ধুত্ব! মনে এক মুখে এক! আসুক না শালা—একদিন না একদিন তো ছাড়া পাবেই, এর শোধ তুলব সেদিন।···হবে না! কেমন রক্ত ওদের। ছোটলোক বেইমানের বংশ। বোন-বেচা পয়সায় খায়—ওদের সঙ্গে মেশাই উচিত নয়। জেনেশুনে খান্‌কীর মতো ওর বোনটা পয়সার জন্যে নিজেকে বেচছে। বলে বামুনের মেয়ে! বামুন না ছাই···ওর মা-টাও তো ঐ পয়সায় খাচ্ছে। আবার জামাই বলে সোহাগ কত!...ঐ নন্তেটার সঙ্গে আমাদের মেশাই উচিত নয়।'

সজল তাড়া দিয়ে ওঠে।

'নে নে চল্‌। ওদিকের খবর নিই চ'। আমাদের সব ঘাঁটিতেও খবর দিতে হবে। শোধ নিবি তো পরে—এখন নিজেরা বাঁচ। ও বেটা মারের চোটে কত কি বলে ফেলবে হয়ত। ও কেন—কাজল-বাবুয়ারা—নিজেরা বাঁচার জন্যে হয়ত আরও কত ছেলেকে জড়াবে। তুই বাদল অবু—বেশী নামকাটা তোরা বরং কিছুদিন অন্য কোথাও গা-ঢাকা দে। শুধু জুয়া কি চোলাই মদের কারবার

হ'লে অত হ'ত না। খুনের ব্যাপার আছে যে। বুলি মিস্তির সহজে ছাড়বে না।'

'বুলিটাকে সরায় নি কেন ?'

'অত সহজ নয় দাদা। বুলির কে আত্মীয় আছে, সেণ্টারের হোমরাচোমরা কংগ্রেসওলা—তাকে পুরো ব্যাপার জানিয়ে দিয়েছে নাকি, ঘুষ খেয়ে পুলিস চুপ ক'রে বসেছিল কোন স্টেপ নেয় নি—এই ব্লেম দিয়েছে। খোদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সে চিঠির কপি গেছে। সেই ধাতানি খেয়ে পুলিশ ছুটোছুটি করছে এত—ওদের আর এলাকাঁড়ি দেবার জো নেই।'

মুখে যা-ই বলুক, ভয় পেয়েছে ফুচুন। খুবই ভয় পেয়েছে। আকারহীন আতঙ্ক একটা যেন অশরীরী ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ঠিক কি ভয়, কিসের ভয়,—কতটা ভয় পরিষ্কার বুঝতে পারলে বোধহয় এমনটা হ'ত না।...

গাড়ি আসছে একখানা। দূর থেকে তার ইঞ্জিনের আলোটা এসে পড়ল। তাতেই দেখল হারু মুখখানা সাদা হয়ে গেছে ফুচুনের। সেই ফুচুন, যে পাঁচ মিনিট আগেও ওকে কেটে লাইনে শোয়াচ্ছিল।

হঠাৎ খুব হাসি পেয়ে গেল হারুর। নিজের বিপদ কি কষ্টের কথাও যেন মনে রইল না সে সময়টায়।

কিন্তু আলোটা একেবারে ওদের মুখে এসে পড়তে সবাই চমকে উঠল। হারুও। কিসের একটা ভয়ে বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। ওরা যেন লুকিয়ে আত্মগোপন ক'রে ছিল এতক্ষণ, দুনিয়ার নজর পড়ে গেল ওদের ওপর, এক নিমেষে।

হয়ত মালগাড়ি, হয়ত ড্রাইভাররাও দেখতে পায় নি, ওদের অত সময়ও নেই হয়ত। হয়ত কারুরই নজরে পড়ে নি। এ আলোও একমুহূর্ত পরে সরে এগিয়ে যাবে, ওদের ওপর নেমে আসবে অন্ধকারের আবরণ—কিন্তু এসব কোন বিচার ক'রে কি বুদ্ধিপ্রয়োগ

ক'রে নয়—অকারণেই ভয় পেয়ে গেল ওরা। লুকিয়ে বসে আছে এমন কোন ফেরারী আসামীর মুখের ওপর পুলিশের টর্চ এসে পড়লে যে অবস্থা হয়—ওদেরও প্রায় সেই অবস্থা।

দুড় দুড় ক'রে সরে গিয়ে তারের বেড়ার ওপরের চারটে সিঁড়ি টপকে ওদিকের রাস্তাটায় গিয়ে পড়ল, অপেক্ষাকৃত ছায়া-ঢাকা অন্তরালে।

ভয় জিনিসটা কোন কোন অসুখের মতো—হু হু ক'রে বেড়ে যায়। ফুচুনের ঠোঁট দুটো কাঁপছে তখন, পা. দুটো অবশ মনে হচ্ছে। বললে, 'কোথায় যাওয়া যায় বল্ তো? বাড়ি ফিরব এখন, না অন্য কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে থাকব?'

আশ্চর্য, সজলকেই তখন অভিভাবক মনে হচ্ছে তার।

'না না, চল্ না যাই ওখানেই,' সজল ওরই মধ্যে একটু অভয় দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'ওদের ঐ ক্লাবঘরের কাছে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে—গজালি হচ্ছে খুব! দূর থেকে শুনে আসি চল্, কী ব্যাপার, কতদূর কি গড়াল। তারপর অবস্থা বুঝে তখন যা হয় করা যাবে।'

ওরা দুজনে দ্রুত আবার ঐ পাড়ার পথ ধরল। হারুকে ওরা বোকা ভাবে, অকর্মণ্য। ওর কথা ফুচুনদের মনে রইল না। ওকে সঙ্গে নেবার কথাও মনে হ'ল না। অথবা হারু ঠিক পিছনে আসছে—ধরেই নিল।

॥ ২১ ॥

হারু কিন্তু ওদের সঙ্গে সঙ্গে গেল না। দু-চার পা গিয়েই পিছিয়ে পড়ল। দিনদাদের চালাঘরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সজলরা বাঁক ঘুরে সুরেশ সান্যালের বাড়ির আড়াল হ'তে আস্তে আস্তে অন্য পথ ধরল। নিজেদের বাড়ির পথই। ফুচুনদেরও বাড়ির পথ এটা। অন্ততঃ খানিকটা পর্যন্ত।

আসলে চন্দনকে ধরতে হবে ওর। ফুচুনের মাথার ওপর আরও বড় বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, এখন আর হয়ত এসব তুচ্ছ ফাল্‌তু কথা মনে নেই। তবু যা হিংসে দেখল চন্দনের ওপর—একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার। চন্দন যা ছেলে হয়ত সত্যিই তার আর ফুচুনের বাড়ি গিয়ে এই সব বলে আসবে।·· আর এখন ভুলে গেলেও—সত্যি সত্যিই যদি চুকলি খায় চন্দন ওদের নামে—ফুচুন ক্ষেপে যাবে একেবারে। সাবধান ক'রে দিতে হবে চন্দনকে। কি দরকার তার এই সব ছেঁড়া কথায় থাকবার! হারুর বাড়িতে বললে কিছু হবে না বিশেষ, কিন্তু ফুচুন যদি জানতে পারে, প্রচণ্ড ছোটলোকমি করবে।

ফুচুনদের বাড়ির কাছাকাছি ঘুরে বেড়িয়ে এল। কারুরই সাড়া-শব্দ পেল না। হয় চন্দন আসে নি, শুধু ভয়ই দেখিয়েছিল, নয় তো আগেই হারুদের বাড়ি গেছে। এর মধ্যে এতটা এসে কথাবার্তা সেরে চলে যেতে পারবে বলে তো মনে হয় না। এসে পৌঁছলেও দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলত। যদি কথাটা বলে চলে গিয়ে থাকে সত্যিই—তো কেলেঙ্কারী।

হারু কি তাহলে নিজেদের বাড়ির দিকেই দেখবে একবার? না এখানেই অপেক্ষা করবে? ওখান থেকে যদি এখানে আসে সেই ভরসায়?

ভাবতে ভাবতেই ফিরে আসছিল হারু, কখন যে নন্তুদের গলির মোড়ে এসে পড়েছে টের পায় নি। হঠাৎ একেবারে অসীমার মুখোমুখি হতে চমক ভাঙল।

ফুচুনদের গলি আর নন্তুদের গলি তুটোই সমান্তরালভাবে বড় চওড়া রাস্তাটা থেকে বেরিয়েছে। নন্তুদের সেই বারো ফুট গলিটার মোড়েই উদ্বিগ্ন পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল অসীমা। তার কপালে গলায় চকচক করছে ঘাম, হয়ত হাতের তালুও ঘেমেছে—বিপন্নভাবে দাঁড়িয়ে তু'হাতে রুমালখানা কচলাচ্ছে।

ভয় পেয়েছে তো বটেই কিন্তু নন্তুর জন্যেই কি এত ভয়? না কি, পাছে কান-টানলে-মাথা-আসার মতো ওকে আর ওর 'বর'কেও এর মধ্যে জড়ায়—সেই ভয়?

তা হোক, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু অসীমাকে।

ভয়-ভয় ভাব সত্ত্বেও খুব ভাল দেখাচ্ছে।

অসীমা যে এত সুন্দর—তা হারু এর আগে কোনদিন লক্ষ্য করে নি।

অসীমা দূর থেকে ওকে দেখে—ওদিকটা অন্ধকার—বোধহয় ঠিক চিনতে পারে নি, আরও ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে গিছল—এখন রাস্তার আলোটা হারুর মুখে এসে পড়তে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল।

'কে, হারু? বাঁচালে ভাই! যা বিপদে পড়েছি!'

'কি হয়েছে অসীমাদি? এখানে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?'

নন্তুর কথা যে শুনেছে তা না-ই বলল।

কিন্তু অসীমাও কম যায় না, চালটা ধরে নিয়েই বলল, 'আমি হঠাৎ এসে পড়েছি—এসব ব্যাপার তো জানতুম না, এখন শুনছি মা ছোট দুটোকে সঙ্গে নিয়ে থানায় দৌড়েছে, তার বিশ্বাস ওদের দেখলে ইন্‌স্‌পেকটর দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে নন্তুকে। একা এখানে থাকব, খুব ভয় করছে। তুমি—তুমি একটু থাকতে পারবে? মা যতক্ষণ না ফেরে?'

'তা পারব। চলুন। কিন্তু এত রাত্রে একা এভাবে আপনার আসা ঠিক হয় নি অসীমাদি। এই একগা গয়না নিয়ে—এই দিনকাল। এসে যে পৌঁচেছেন তাই ঢের।'

'এ কি আসল গয়না? হরি হরি। হাতের আংটিটা ছাড়া একটাও সোনার নয়—সব ফল্‌স্‌, মেকি। অবিশ্যি এরও দাম আছে, কানের এই দুল দুটোরই দাম পঞ্চাশ টাকা, নেকলেশ আশি। তবে সে যা দাম ঐ কেনার সময়ই, বেচতে গেলে কিছুই না।'

'কিন্তু আপনি তো আর মেকি নন। বিপদ আপনার জন্মেও ঘটতে পারত।'

কথাটা যেন আপনিই বেরিয়ে গেল হারুর মুখ দিয়ে। এ ভাবে কথা কখনও বলে না সে, তোষামোদের কথা—ইংরিজীতে কী যেন বলে—কম্‌প্লিমেণ্ট না কি, রবীন মাস্টার কী যেন একটা বলে—জানেও না হারু। এখন মনের মধ্যে অসীমার রূপের তথ্যটা বড় হয়ে আছে, নবাবিষ্কারের বিস্ময়টা তখনও কাটে নি বলেই বেরিয়ে এল কথাটা।

কিন্তু অসীমা যে খুশী হ'ল—এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও—তা ওর চোখ-মুখের ঝলমলানি দেখে বোঝা গেল। হয়ত লালও হ'ল একটু, রাস্তার আলোয়—এই আলোটা নন্তুর দরকার বলেই চুরি হয় না—ঠিক বোঝা গেল না।

'বা রে, তুইও যে শহুরে ভব্যতা শিখে গেলি।···ভাল লাগছে সত্যিই?—ভাল দেখাচ্ছে?'

'আহা রে, তা যেন আপনি জানেন না! কিন্তু আপনি এভাবে এলেনই বা কেন এত রাতে—? খবরটা এর মধ্যে কে আপনাকে দিলে?'

'এ খবর শুনলে আমি আসতুমই না! আমি উল্‌টে নন্তুকে ডাকতেই এসেছিলুম। আমারও যে খুব বিপদ ভাই।···তোমার জামাইবাবু, কী আর বলি, লাজলজ্জার মাথা খেয়েই বলছি, তোমরা বড় হয়েছ—আর কাঁহাতকই বা ঢাকব—স্বভাব তো যায় না—কে একটা বাজে মেয়ে রাস্তায় বলেছে—আমাকে একটা লিফ্‌ট্ দেবেন? উনিও পাশে তুলে নিয়েছেন। তারপর সে বুঝি বলেছে তার ক্ষিদে পেয়েছে, চাকরির জন্মে সারাদিন ঘুরছে —পয়সা নেই, হেঁটে হেঁটেই ঘুরেছে, পা আর চলছে না—এই সব এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা। উনি হোটেলে নিয়ে গেছেন, খাইয়েছেন —চাকরির জন্মে উমেদারী করতে যাবে ভাল শাড়ি নেই বলেছে, সে জন্মে একশোটা টাকা দিয়েছেন—তারপর ওঁর যা রোগ, কথা

কইতে কইতে ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গেছেন। সে ঘর ভাড়া করাই থাকে ওঁর, আমাকে বলেছেন ও পাট তুলে দিয়েছেন, কিন্তু তা দেন নি। মেয়েটা কিছু বলে নি, রাজীই আছে মনে হয়েছে— কিন্তু ঘরে গিয়ে যেমন দোর দিয়েছেন উনি—দমাদ্দম দোরে লাথি। বাপ-ভাই দু-তিনজন গুণ্ডা নিয়ে হাজির হয়েছে। আসলে এ সবই সাজানো—বাপ-ভাইও হয়ত ঐরকম, মিথ্যে বাপ-ভাই— এই ওদের পেশা, অন্য গাড়িতে বোধ হয় পিছু পিছু এসেছে। যাই হোক, এখন তো প্যাঁচে পেয়েছে—ভদ্দরলোকের মেয়েকে ফুসলে এনে ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, এখানে এই সব চলে—হোটেলও'লাকেও ডেকে ধমকেছে, পুলিসকে টেলিফোন করতে গেছে, হোটেলও'লা ভয় পেয়ে পায়ে-হাতে ধরতে তার কাছ থেকে দু'হাজার আর ওঁর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চেয়েছে। হোটেলও'লা দিতে রাজী ছিল—কিন্তু উনি একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, এই জুচ্চুরি ব্যবসা তোমাদের ভাঙতে হবে, পুলিসেই খবর দাও, আমি জেলে যেতে রাজী আছি। তবে আমি যাই কি শেষ অ... তোমরা যাও—সেটাও বুঝে নোব।...তাদের তো পুলিস ডেকে কোন লাভ হবে না—ওরা আরও কিছু হাঁকাই হোঁকাই করেছে, ইনিও বেনের বাচ্চা; এক পয়সা দিতে রাজী হন নি—তখন হঠাৎ সেই গুণ্ডা দুটো ছোরা বার ক'রে চার-পাঁচ জায়গায় স্ট্যাব ক'রে পালিয়েছে। একজনের হাতে নাকি একটা রিভলভারও ছিল, হোটেল কি আশেপাশে যারা ছিল—কেউ কিছু বলতে সাহস করে নি। সেই অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অবস্থা নাকি বিশেষ ভাল নয়, বাঁচবে কিনা তাই এখনও বলা যাচ্ছে না—তবে বাঁচলেও ভাল হয়ে উঠতে ছ'মাস অন্তত।'

বলতে বলতে অসহায় আর করুণ হয়ে উঠল অসীমার মুখ।

হারু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, ওসব অলুক্ষুণে কথা বলতে হবে না। আমি বলছি শীগগিরই ভাল হয়ে উঠবেন। চলুন, বাড়ি চলুন। কিন্তু বাড়িতে তো মা বোধ হয় চাবি দিয়ে গেছেন—

তাহলে? এত রাত্রে আপনার নিজের বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না।'

'না ভাই, সে যাবোও না। নন্তকে চাই। না পেলে অন্ততঃ মাকে নিয়ে যাবো কাল।··· এখানের চাবি আছে। একটা লুকনো জায়গায় চাবি থাকত, সেখানেই আছে। আমারই ব্যবস্থা সেটা—মা এখনও বজায় রেখেছে। কিন্তু একা থাকতে বড্ড ভয় করছে, মনে হচ্ছে যদি তারা আসে, কিছু পায় নি এই আক্রোশে আমাকে সুদ্ধ মারপিঠ করে? কে জানে পিছু নিয়েছে কিনা।'

খুব মায়া লাগল হারুর, ওর অবস্থা দেখে। কোথায় কি কাজে বেরিয়ে ছিল তাও মনে রইল না। বলল, 'চলুন, আমি থাকছি—মাসিমা কি নন্ত যতক্ষণ না আসে।'

তালা খুলে বাড়িতে ঢুকল অসীমা। সুইচ কোথায় তা তো জানাই, হাত বাড়িয়ে আলোও জ্বালল। বাইরের ঘরের দরজাতেই তালা লাগানো থাকে– দুটো তো মোটে ঘর—এই ঘরেই নন্ত থাকে, বিছানা পাতাই আছে। এই সুবিধের জন্যেই আরও নন্তর দুনো মজা—এদের বিশ্বাস, গভীর রাত্রে এসে ঘরে ঢুকলে কেউ টের পাবে না। এমন আসেও দু-চারটে মেয়ে, শুনেছে হারু।

অসীমা কিন্তু এ ঘরে বসল না, পাশের ঘরের দরজা খুলে—যেটা ওদের ঘর ছিল, মা আর ভাই-বোন যেখানে শোয় এখনও—সেইখানে গিয়ে বসল, হারুকেও বসাল। চওড়া বিছানা, ছেলেদুটো বোধ হয় শুয়েও পড়েছিল– চাদর আর বালিশের অবস্থা দেখে তাই মনে হয়—বিপদের খবর শুনে হঠাৎ উঠে গেছে।

টিনের ঘর, ছোট জানলা। ঘরে পাখা নেই। ভ্যাপ্সা গরম। ভেতরের হাওয়া যেন তেতে আছে। অসীমা তাড়াতাড়ি ওদিকের দুটো জানলাই খুলে দিল—তবুও যথেষ্ট ঠাণ্ডা হ'ল না। হবেই বা কি ক'রে। জানলার তিন ফুটের মধ্যেই নাগেদের দেওয়াল।

অসীমা একটা হাত-পাখা খুঁজে নিয়ে হারুর পাশে এসে বসল, হাওয়াও করল একটু। মানে নিজেও খেল—এমনভাবে যাতে দুজনেই হাওয়া পায়। তবে তার এসব অব্যেস নেই অনেককাল, হাতনাড়ার ধরন দেখেই বুঝতে পারল হারু, পাখাটা টেনে নিয়ে সে-ই হাওয়া করতে লাগল।

'সত্যি ভাই, ভাববে চাল দেখাচ্ছি, আমার বাড়িতে পাইখানায় সুদ্ধ পাখা ফিট করা। এই সেদিন আবার বলছিল—শোবার ঘরটা এয়ারকণ্ডিশান করিয়ে নেবে।...আমার এখন এখানে এলে খুব কষ্ট হয়।'

তারপর হঠাৎ—একটু অসংলগ্নভাবেই বলে উঠল, 'তোমারও চেহারাটা খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে কিন্তু। নন্তুদের দলের মধ্যে তুমিই বোধহয় সবচেয়ে ভাল দেখতে—'

'কী যে বলেন। যা-তা।' হারুর মুখ লজ্জায় আর খুশিতে লাল হয়ে উঠল।

'না না, সত্যিই বলছি। বিশ্বাস করো। ক'মাস দেখি নি—এর মধ্যে যেন খুব ডেভেলপ্‌ড্‌ হয়ে উঠেছ।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'ইস। কী ঘামছ। জামাটা খুলে ফ্যালো না।'

হারু একটু লজ্জা পেল। এখানে এসে এইভাবে বসা থেকেই তার অস্বস্তি আর লজ্জার ভাবটা দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'না না। থাক। কতক্ষণই বা।'

'তা কি বলা যায়, কতক্ষণে ফিরবে মা? হয়ত রাতটাই তোমাকে এখানে থাকতে হবে। কিন্তু তোমার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া বোধ হয় উচিত ছিল। ওঁরা খুব ভাববেন—'

'না। দরকার হবে না। আমি—আমি একটু রাগারাগি ক'রেই চলে এসেছি, রাত্রে না গেলে ভাববেন না। বরং এখন—এই সব যদি শুনে থাকেন—খবর দিতে গেলেই আটকে ফেলবেন।'

'তবে তো ভালই। আমার জন্যেই বোধহয় তুমি রাগারাগি ক'রে বেরিয়েছিলে।' হাসল একটু অসীমা।

তার পরই এর অন্য দিকটা মনে পড়ল, 'কিন্তু তোমার খাওয়ার কি হবে? এ বাড়িতে তো বোধহয় কিছুই নেই। ওরা তো সন্ধ্যেবেলাই খেয়ে নিয়েছিল। এক যদি নন্তুর খাবারটা ঢাকা দেওয়া থাকে—'

'না না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এক জায়গায় একটু খেয়ে নিয়েছিলাম।' মিথ্যে ক'রে বলল হারু।

পাখা নাড়ানো বন্ধ হয়ে গিছল, স্বভাবতই। মন কাজ করতে থাকলে, বিশেষ যদি অনেক চিন্তা জট পাকায়—হাত থেমে যায়।

অসীমা বলল, 'ওঃ, কি অবস্থা তোমার! নেয়ে উঠেছ যে একেবারে। খোল খোল, জামাটা খুলে ফেল। অত লজ্জা কি, ভেতরে তো গেঞ্জি আছে। নন্তুর পাজামা দোব একটা—প্যাণ্টটা ছাড়বে?'

জামাটা সত্যিই অসহ্য লাগছিল, খুলেই ফেলল হারু। তাছাড়া ঐ জামাটা পরে থাকতে লজ্জা করছে। তখন লাইনের ধারে নালায় পড়ে ধুলো লেগেছিল, ঝেড়ে ফেললেও সবটা যায় নি—এখন ঘামে ভিজে কাদার মতো দাগ ফুটে উঠেছে।

ওর হাত থেকে জামাটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে অসীমা আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। তারপর একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। ওপরের জামাটা খুলে ফেলি। কিছু মনে করবে না তো? বরং আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি, ওঘরে তো আলো জ্বলছেই—ক্ষতি হবে না। কি বলো?'

হারু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি বরং ওঘরে যাই। একটু শুয়ে পড়ি গে। আপনিও বিশ্রাম করুন একটু—'

'না না। আমি একা থাকতে পারব না। তুমি এখানেই শোও। তাতে দোষ কি? কেউ তো আর জানছে না।'

বলতে বলতেই আলোটা নিভিয়ে দিল অসীমা।

তারপর কাছে এসে হারুর হাত ধরে এক রকম জোর ক'রেই বিছানায় শুইয়ে দিল।

বললে, 'অনেক তো বড় বিছানা—ঢের জায়গা আছে।'

একটু পরে জামা খুলে সে-ও শুয়ে পড়ল পাশে।

কিন্তু কে জানে কেন, ব্যবস্থাটা হারুর খুব বিশ্রী লাগল।

একটা কেমন অস্বস্তির ভাব।

নিজের মনের চেহারাটা দেখতে না পেলেও লোভের যন্ত্রণাটা পীড়া দিচ্ছে।

যেন তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা একটা।

না, এ জীবন থেকে মুক্ত হ'তেই হবে।

তার জন্য যা করতে হয় করবে, নিমুদার কাছে না হয় মাপই চাইবে সে। ঐ চাকরিটা যদি ক'রে দিতে পারে নিমুদা—। না হয় অন্য যে কোন চাকরি। তারপর কিছু একটা কাজ পেলে সকালের কি সন্ধ্যের কলেজে ভর্তি হবে।

মানুষ হ'তে হবে ওকে। অন্তত ঐ চন্দনের মতো।

ঐ তো জীবন। এ কি ওরা বেঁচে আছে? একে বেঁচে থাকা বলে না। এ সব লোভেরও কোন অর্থ হয় না, একঘেয়ে একই জিনিষের পিছনে দৌড়নো।...

হঠাৎ অসীমা ওর দিকে ফিরে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল ওকে।

'ধ্যেৎ!' বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়ল সে—তারপর আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে সেই অন্ধকারেই একরকম ছুটে বেরিয়ে পড়ল—অসীমা বাধা দেবার, এমন কি ঠিক-কি-ঘটছে বোঝবার আগেই।